

Vol. 50 | No. 2-3 | 2013

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সমকালীন উপন্যাসে বাংলাদেশের প্রশাসন-চিত্র ও রাজনৈতিক বাস্তবতা

Volume	50
Issue	2-3
Year	2013
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Munira Sultana
Published online	June 1, 2013
DOI	10.62328/sp.v50i2-3.9
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v50i2-3.9
Pages	১৪৭-১৭৪
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সমকালীন উপন্যাসে বাংলাদেশের প্রশাসন-চিত্র ও রাজনৈতিক বাস্তব

Check for updates

মুনিরা সুলতানা*

প্রশাসন ও রাজনীতি যে কোনো রাষ্ট্রের জন্যই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশেষত আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ব্যক্তিমানুষের রাজনীতি এবং ব্যক্তির অবস্থান-কাঠামো তথা শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা একটি গতিশীল প্রসঙ্গ হিসেবে বিবেচিত। ব্যক্তির রাজনীতি চেতনার সংশ্লিষ্টতা কিংবা সময়ের বাস্তবতায় রাজনীতির মধ্যে অবস্থানরত মানুষ ও তার ইতিহাস নানাভাবে বাণীবদ্ধ হয়েছে সাহিত্যে। রাজনীতিই যেন মানুষকে গঠন করছে, তার পাদপীঠ তৈরি করছে, তাকে মননশীল করছে, কখনও স্বার্থপর বা মানবতাবাদী করছে। সাহিত্যে আধুনিক মানুষের জীবন বা রাজনীতি চেতনা একটি সাধারণ বিষয়। শিল্প কী এটা চিরন্তন জিজ্ঞাসা। বিভিন্ন কালে বিভিন্ন সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে শিল্পবিচার পদ্ধতি বা শিল্পদৃষ্টিভঙ্গির ফারাক হয়। তবু শিল্পসৃষ্টির মৌলিক অনুপ্রেরণা একটা অপরিবর্তনের সূত্রকেও নির্দেশ করে। তা হল বাস্তবতা থেকে সৃষ্টির প্রেরণা। বাংলা সাহিত্যে কেবল উপন্যাস নয়, সাহিত্যের অন্যান্য মাধ্যমে যথা— নাটক, ছোটগল্প, কবিতায় রাজনীতি অনিবার্য বিষয় হিসেবে এসেছে। এর গুরুত্ব কালে কালে বেড়েছে এবং সমকালীন লেখকের চেতনায় তা ভিন্নরকম গুরুত্ব পেয়েছে। আধুনিককালে ব্যক্তিচেতনায় রাজনীতি কতটা গভীর বিষয়, রচনাগুলো তাই প্রমাণ করে। 'বাংলা সাহিত্যে গদ্যের আবির্ভাবের সঙ্গে বাংলার রেনেসাঁস-উদ্ভূত নব জীবনবেদ, জীবনজিজ্ঞাসা, পরিবর্তিত অর্থনীতি ও সমাজবিন্যাসের এবং রূপান্তরিত নব মূল্যবোধের প্রশ্ন জড়িত ; আর এই পরিপ্রেক্ষিতে ও সূত্রে বাংলা উপন্যাসের জন্ম। (আকরম, ১৯৯৭ : ৬৬)। ঔপন্যাসিকের কাছ থেকে জীবন, সমাজ ও সভ্যতার সামগ্রিক দ্বন্দ্ব, বৈচিত্র্য ও ক্রমবিকাশের রূপায়ণ আশা করা যায়, কারণ এ শিল্প প্রায়ই জীবনের সমগ্রতাসন্ধানী এবং তার বিস্তীর্ণ প্রকাশে তৎপর। অবশ্য দেশ-কাল-ইতিহাস-সভ্যতা ও ব্যক্তিজীবনের সংযোগ, সংঘাত–সংঘর্ষ সাহিত্যের যে কোনো মাধ্যমে শিল্পরূপ পেতে পারে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে উদ্ভব হওয়া বাংলা উপন্যাস ক্রমেই সমকালীনতাকে ধারণ করে বেড়ে উঠেছে। তবে সমকালীনতা অর্থে রাজনীতি ও শাসনতন্ত্র কোনো বিশেষ মতবাদকে অঙ্গীকার করে বিষয়বস্তু হিসেবে উপন্যাসে এসেছে আরো পরে। এ প্রসঙ্গেই উল্লেখ্য যে, রাজনৈতিক শিল্প হিসেবে উপন্যাস আর উপন্যাসে বিধৃত-রূপায়িত রাজনৈতিক সত্য কিংবা বাস্তবতা এক ব্যাপার নয়। রাজনৈতিক ঘটনাবলিই প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে — এরকম উপন্যাসকে প্রাথমিকভাবে রাজনৈতিক উপন্যাস বলা যায়।[১] আবার সমসাময়িক কালের রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ঔপন্যাসিকের সক্রিয়ভাবে যুক্ত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনেকেই অনুভব করতে

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পারেন। আবার অনেকেই একে অপ্রয়োজনীয় মনে করেন। তাঁদের মতে, প্রকৃত রাজনৈতিক ঔপন্যাসিকের কাজ হল দূর থেকে নিরাসক্ত অথচ সতর্ক দৃষ্টিতে সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাবলি বিশ্লেষণ করা এবং রাজনৈতিক স্রোতের আবর্তে ভাসমান মানবজীবনের বাস্তবচিত্র আঁকা। অন্যদিকে আধুনিককালে অনেক লেখকের জীবনবোধে কিংবা সৃষ্টিকর্মে একটি সুনির্দিষ্ট সামাজিক অঙ্গীকারের (social commitment) তত্ত্ব শিল্পের উপযোগিতা কিংবা প্রয়োজনীয়তার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। আর এটি নান্দনিক এক বিশ্বাস হিসেবেই বিবেচিত হচ্ছে।

খ.

বাংলা সাহিত্যে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই উপন্যাসের উদ্ভব ঘটে এবং এর সার্থক পথিকৃৎ হিসেবে এখন পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বীকৃতি লাভ করে থাকেন। বাংলা ভূখণ্ড আর তাতে বসবাস করা মানুষের প্রসঙ্গে আসে বিশেষ সেই দেশসত্তার কাল-পরিধি; মোটামুটি ভাবে সমস্তটা মিলিয়ে যা, তারই পশ্চাৎপটে রয়েছে বাংলা উপন্যাস ও এর ধারা। '৪৭-এর দেশবিভাগ উপমহাদেশের প্রায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা, যা দুটি, প্রকারান্তরে তিনটি রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছিল। পাকিস্তান পর্বে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে পূর্ব-বাংলায় সংগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলন পূর্ণ রূপ পায় মুক্তিযুদ্ধ তথা স্বতন্ত্র, স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের প্রেরণার মধ্য দিয়ে। পূর্ব বাংলার মানুষ সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শক্তির শোষণের স্বরূপকে বুঝে নিয়েছিল বলে এটা সম্ভব হয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক এবং একটি জাতীয়তাবাদী আদর্শের সূত্র ধরে শোষণমুক্তির চেতনা সর্বস্তরে প্রসারিত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর সংবিধানের চার মূলনীতি সংযুক্তির ক্ষেত্রে সংগ্রামশীল জাতির আকাঙ্ক্ষার স্বপ্নকে বাস্তবায়নের একটা প্রয়াস লক্ষ করা যায়। 'কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর সময়গুলোতে একটি ভগ্ন উপনিবেশশাসিত রাষ্ট্রের সংগঠিত হবার পেছনে প্রধান প্রতিবন্ধকতা ছিল সাম্রাজবাদী নানা আন্তঃঅপশক্তি, স্বাধীন রাষ্ট্রের ক্ষমতার লোভ। একই সাথে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি যুদ্ধক্ষয়ে বিভ্রান্ত রাষ্ট্রে ক্রমাগত দ্বন্দ্বের জন্ম দিয়েছে। ফলে আর্থ-সমাজের নানা ক্ষেত্রে মূল্যবোধের অবক্ষয়, সন্ত্রাস, অশিক্ষা, হিংসা, হানাহানি অর্থ-সংকট বেড়েছে। মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের এইরকম প্রেক্ষাপটের জন্য দায়ী অনেকাংশে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ শক্তি এবং আওয়ামী বিকল্প রাজনীতি শূন্যতা।' (শহীদ, ২০০৩ : ৩৪)। বামপন্থীরাও যথাযোগ্য সাফল্যের পরিচয় দেয়নি। দেশে পরপর সামরিক শাসন গণতান্ত্রিক ভাবধারাকে ক্ষুণ্ন করেছে। বাহ্য অর্থে গণতান্ত্রিক শাসনের প্রতিষ্ঠা ১৯৯০-এর অভ্যুত্থানের পূর্বে ঘটেনি। আওয়ামী লীগের পাশাপাশি ততদিনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল প্রসার লাভ করেছে। রাজনৈতিক দলগুলো গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেও ক্ষমতায়নের মাত্রা বাংলাদেশকে সেই অর্থে পূর্ণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারে নি। এখনও পর্যন্ত রাজনৈতিক অস্থিরতা, ধর্মবুদ্ধি ও স্বার্থবুদ্ধির চর্চা এদেশকে কিছুটা পিছিয়ে দিয়েছে। এদেশের প্রশাসনিক কাঠামো ও এর বিকাশ ভিন্ন রাজনৈতিক সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়ে এগিয়েছে। সাহিত্য বিশেষত বাংলা উপন্যাস এসব আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সাথে নিরবচ্ছিন্নভাবে জড়িত প্রশাসনিক কাঠামো

ইত্যাদি নিবিড় সত্যে ধারণ করেছে, হয়ে উঠেছে আমাদের জাতীয়, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসের বিশ্বস্ত দলিল। উপন্যাস যেহেতু জীবনের সমগ্রতাস্পর্শী শিল্প-আঙ্গিক, সে কারণে সমাজজীবনের অন্তর-বাইরে বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞানের রূপায়ণই তার স্বধর্ম। কারণ, সময় ও সমাজচেতনা পরিস্রুত ব্যক্তিচৈতন্যের স্তরময় আত্মপ্রকাশ আকাঙ্ক্ষা এবং তার সামাজিকীকরণের অনিবার্যতাবোধ থেকে শিল্প-সাহিত্যের সৃষ্টি। আর উপন্যাসশিল্প উদ্ভবের পেছনে কাজ করেছে সমাজগঠন, আর্থ-উৎপাদন কাঠামো, জীবন অবলোকনের সমগ্রতাবোধ এবং অস্তিত্ব জিজ্ঞাসার দ্বন্দ্বময় ক্রমবিকাশের সঙ্গে সংলগ্ন শিল্প অভিপ্রায়। স্বাধীনতা-উত্তরকালীন সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রত্যাশিত গুণগত পরিবর্তনহীনতা ঔপন্যাসিকদের রাজনৈতিক জীবনজিজ্ঞাসাকে অস্থির ও দ্বন্দ্বময় করেছে। একটি স্বাধীন সার্বভৌম ভূখণ্ডের সমাজচেতনা প্রবাহ পেছনমুখী হওয়ায় ঔপন্যাসিকের প্রাগ্রসর মন দ্বিধাদীর্ণ ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। তাছাড়া, দীর্ঘকালের কালোনিশাসন ও জাতিশোষণে বিপর্যস্ত বাংলাদেশের সমাজকাঠামো কিংবা প্রশাসনিক-রাজনৈতিক পরিবেশে পরিবর্তনের পথ অনেকটাই রুদ্ধ থেকে গেছে। 'গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং ব্যক্তির বিকাশের সুবিধাবঞ্চিত সমাজ-রাষ্ট্রে সংবেদনশীল মধ্যবিত্ত মানসের সঠিক বিকাশ ঘটেনা, অগ্রগমনের পরিবর্তে সূচিত হয় বৃত্তবদ্ধতা এবং আত্মভুখ চেতনার ক্রমবিস্তার।' (রফিকউল্লাহ, ১৯৯৭ : ১১৫)। অর্থনৈতিক দুরবস্থার সুযোগে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেতিবাচক শক্তির উদ্ভব ও প্রসার দ্রুততর হতে পারে; বিশ্ব পুঁজিতন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত পটভূমিতে 'তৃতীয় বিশ্বের' একটা দরিদ্র দেশের জন্য তা একটা স্বাভাবিক পরিণতি। এভাবেই ধীরে ধীরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে অঙ্কুরিত হয়েছে হতাশা ও ব্যর্থতাবোধের বীজ। পাকিস্তানের দীর্ঘ-শোষণ এবং নয় মাস ব্যাপ্ত যুদ্ধে বাংলাদেশের আর্থ-উৎপাদন কাঠামো মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিল, সে বিপর্যয় অতিক্রম করার জন্য যে সুস্থ প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কাঠামো প্রয়োজন তা আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অসংখ্য সমস্যার সম্মুখীন এই দেশের ছিল না। সমকালীন বাংলা উপন্যাসে প্রশাসন ও রাজনীতির মাত্রা বুঝতে হলে বিভাগোত্তর বাংলা উপন্যাসের ধারা সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা প্রয়োজন। বিভাগোত্তর সময়ের উপন্যাস পূর্ব বাংলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির অস্তিত্বসংকটকে সামনে এনেছে। পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধিকার আন্দোলনের পথে মধ্যবিত্তের সক্রিয় অংশগ্রহণ, শ্রমজীবী-পেশাজীবীর ভূমিকা, ছাত্রসমাজের অনির্বাণ সম্পৃক্তি শুধু রাজনীতির ভিতকে প্রতিষ্ঠা দেয় না; নব্য উপনিবেশবাদী শক্তির তাণ্ডব থেকে মুক্তির নেশায় নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ করার কার্যকর ভূমিকাও পালন করে। বাঙালির এ ঐক্যবদ্ধ হবার রূপ আসলে প্রত্যাশিত পাকিস্তানের প্রতি স্বপ্নভঙ্গ আশাভঙ্গের বিদ্বেষ। বাঙালি মধ্যবিত্ত এর নেতৃত্ব দেয়। এক অর্থে বলা চলে, পূর্ব বাংলার আন্দোলন মুলত মধ্যবিত্তের পাওয়া না-পাওয়ার স্বার্থনিষ্ঠ বেদনা থেকে উদ্ভূত। এ সময়ের সাহিত্যিকেরা মধ্যবিত্তের এ চরিত্রকেই উপন্যাসে এনেছেন। ছাত্র বিক্ষোভ, বিভিন্ন স্তরের মানুষের আন্দোলন, অস্তিত্ব-জটিলতা, নগরজীবনের সংকট কয়েক দশকব্যাপী পূর্ব-বাংলার সংক্ষুব্ধ সময়কে চিহ্নিত করে। ঔপন্যাসিকদের অভিজ্ঞতায় বিভাগোত্তর কয়েক দশকের চালচিত্রই উপন্যাসে উঠে আসে। এক্ষেত্রে সাতচল্লিশোত্তর সময়ের রাজনীতিকে যে সমস্ত লেখক বিষয় করেছেন তাদের উপন্যাসগুলো নানা সময়ে আলোচিত হয়েছে। লক্ষণীয়, মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশে অনেক রাজনীতি

সচেতন ও জীবনবাদী লেখকও বিভাগোত্তর রাজনীতিকেই উপন্যাসে উপজীব্য করেছেন। এসময়ের উল্লেখ্যযোগ্য ঔপন্যাসিক ও উপন্যাস হল– আবু ইসহাকের *সূর্য দীঘল বাড়ি* (১৯৫৫), সরদার জয়েনউদ্‌দীনের *আদিগন্ত* (১৯৫৬), আবু রুশদের *নোঙর* (১৯৬৩), আলাউদ্দিন আল আজাদের *ক্ষুধা ও আশা* (১৯৬৪) শহীদুল্লাহ কায়সারের *সংশপ্তক* (১৯৬৫), সরদার জয়েনউদ্‌দীনের *অনেক সূর্যের আশা* (১৯৬৬), আনোয়ার পাশার *নীড়-সন্ধানী* (১৯৬৮), জহির রায়হানের *আরেক ফাল্গুন* (১৯৬৯), জহিরুল ইসলামের *অগ্নিসাক্ষী* (১৯৬৯), সরদার জয়েনউদ্‌দীনের *বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ* (১৯৭৫), শওকত আলীর *দক্ষিণায়নের দিন* (১৯৭৬), *পূর্বরাত্রি পূর্বদিন* (১৯৭৮), সেলিনা হোসেনের *যাপিত জীবন* (১৯৮১), শওকত ওসমানের *আর্তনাদ* (১৯৮৫), আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *চিলেকোঠার সেপাই* (১৯৮৬), জুলফিকার মতিনের *সাদা কুয়াশার পাখি* (১৯৮৯)।

বাংলাদেশের বিগত কয়েক দশকে (১৯৭১-১৯৯৯) রচিত উপন্যাসের প্রবণতা বিচারের ক্ষেত্রে প্রথমত এক জটিল সমাজ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়। এই জটিল, অন্তর্দ্বন্দ্বময় সমাজ-মানসকে প্রধানত তিনটি সময়পর্বে কোনো কোনো সমালোচক ভাগ করতে চেয়েছেন।[২] এগুলো হল :

> ১. ১৯৭১-১৯৭৫ কালপর্ব : এ পর্যায়কে চিহ্নিত করা যেতে পারে সংগ্রাম, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের কাল হিসেবে। মুক্তিযুদ্ধের পরে বাংলাদেশের সামগ্রিক জীবনকাঠামোতে গুণগত পরিবর্তনের পথ উন্মুক্ত হয়েছিলো। রক্তাক্ত যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ জাতীয় জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আকাঙ্ক্ষাই ছিলো স্বাভাবিক ও সঙ্গত। কিন্তু যুদ্ধোত্তর কালের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনের অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা সমগ্র জাতিসত্তাকে করেছে হতাশামগ্ন ও স্তরকণ্ঠ। স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন প্রত্যাশার বাস্তবায়নে যুদ্ধোত্তর প্রশাসন তেমন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেনি। একটি যুদ্ধোত্তর সমাজের রাষ্ট্রযন্ত্রের পক্ষে তা সম্ভবও ছিলো না। ফলে, অতি প্রত্যাশার আবেগ দ্রুত অতি হতাশায় পরিণত হলো। (রফিকউল্লাহ, ২০০৩ : ৪০)
>
> ২. ১৯৭৫-১৯৯০ কালপর্ব : এ-পর্যায়ের সমাজসত্তার ইতিহাস ক্রমাগত ব্যর্থতার ইতিহাস,পরাজয়ক্লিষ্টতা ও পরাভবচেতনার ইতিহাস। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সামরিক বাহিনী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকায় মৌলবাদী সংস্কৃতির পুনরুত্থান বাঙালি সংস্কৃতির বলশালী প্রতিষ্ঠার পথকে করেছে অবরুদ্ধ। গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং ব্যক্তির বিকাশের সুবিধাবঞ্চিত সমাজ ও রাষ্ট্রে সংবেদনশীল মধ্যবিত্ত মানসের জন্য প্রধান অবলম্বন হলো 'পলায়নপরতা ও আত্মকুণ্ডলায়ন।' (রফিকউল্লাহ, ২০০৩ : ৪০-৪১)
>
> ৩. ১৯৯০-২০০০ কালপর্ব : দীর্ঘ নয় বছরের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে জাতীয় রাজনীতির বিচিত্রমুখী স্রোত গণতন্ত্রের প্রশ্নে এক বিন্দুতে মিলিত হলে স্বৈরাচারের পতন ঘটে এবং সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে একটি সংসদ গঠিত হয় — যা রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতির পরিবর্তে সংসদীয় পদ্ধতির পক্ষে দল মত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। (রফিকউল্লাহ, ২০০৩ : ৪১)

সমকালীন কথাসাহিত্য বা কবিতা বিচারে ২০০০ থেকে ২০১০-এর আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও বিচারযোগ্য। সমাজ ও সমাজকাঠামোর মৌল উপাদানসমূহের অন্যতম হল রাজনীতি, যার মূল মর্মটি হল সামাজিক ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য স্থাপন করা। অর্থাৎ ব্যক্তিকে সমাজের অংশ হিসেবে তার যথাযথ ভূমিকা পালনে সুযোগ করে দিয়ে তার

আন্তরিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। গণতন্ত্রের সাথে রাজনীতি আমাদের দেশে এত বেশি সম্পর্কিত যে, রাষ্ট্রক্ষমতার প্রশ্নেই 'গণতন্ত্র' কথাটি বেশি উচ্চারিত হয়। কিন্তু বাংলাদেশে যেহেতু গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয়নি, তাই এখানে বরাবর গণতন্ত্র রূপ নেয় স্বৈরতন্ত্রে। সুতরাং বৃহৎ জনগোষ্ঠীর স্বার্থ ও অংশগ্রহণ-বহির্ভূত গণতন্ত্র পরিণত হয় 'কতিপয়তন্ত্রে' আর রাজনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনের বদলে চলমান থাকে রাজনৈতিক অস্থিরতা। এর মাঝে উল্লেখযোগ্য হল—

- ক্ষমতাসীনের প্রতি বিরোধী দলের নিদারুণ অসহিষ্ণু আচরণ। বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনীতিতে বিপর্যয়ের ফলে রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে এর প্রভাব পড়া।
- ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদ/জঙ্গিবাদ।
- আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ — দেশ পরিচালনার এই তিন প্রধান ব্যবস্থাকে ঘিরে নানামুখী সংকট তৈরি হওয়া। বিশেষত শাসন বিভাগের ভূমিকা, দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছতা বিষয়ক জটিলতা।
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাতীয়ভাবে প্রভাবশীল না হওয়া। এ চেতনা বিশেষ কোনো দলের নয়, বরং জাতীয় — এ বোধ দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিপর্যস্ত হওয়া।

এছাড়া যেসব উল্লেখযোগ্য আর্থ-সামাজিক সংকট রয়েছে তা হল —

- শিক্ষাব্যবস্থায় পদ্ধতিগত কারণে প্রকৃত শিক্ষার মান কমে যাওয়া, মেধার অপব্যয়।
- প্রযুক্তি বিশেষত মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেটের অপব্যবহারজনিত অপরাধ দ্রুত বেড়ে যাওয়া।
- এসিড-সন্ত্রাস, ধর্ষণ ও নারীর প্রতি নানামুখী সহিংসতা ও নির্যাতন। নারী ও শিশু হত্যাসহ রাজনৈতিক কারণে ব্যক্তিক ও দলীয় আক্রোশে খুন-জখম বৃদ্ধি পাওয়া।
- প্রশাসন ও রাষ্ট্র কিংবা ব্যক্তি মালিকানাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যৌথ দুর্নীতিতে অর্থনীতিসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়া।
- পুঁজি-বাণিজ্যের নব নব উপনিবেশ বা আগ্রাসনে রাষ্ট্রের অবকাঠামোগত অবনতি।

তবে এতসব অস্থিরতার ভেতরে ইতিবাচক দিক হলো — সময়ের দাবিতেই জনগণ তাদের জীবনের চাহিদা সম্পর্কে পূর্বের চেয়ে সচেতন। ফলে শাসন-বিভাগের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সুযোগও বেড়েছে। সমকালীন সাহিত্যিকের সৃষ্টিতে এই আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও রাজনীতির প্রতিফলন ঘটেছে। তবে সাহিত্যিকের জীবনদৃষ্টির ভেতরে সমাজ, রাষ্ট্র কিংবা বিশ্বকে অবলোকনের যে নিরপেক্ষতা থাকা প্রয়োজন, তা সবসময়ই ঘটে না। সাহিত্যিকের নিজস্ব রাজনৈতিক ও অন্যান্য দর্শন-বোধ-বিশ্বাস কিংবা অর্জিত জ্ঞানের চর্চার একটা স্বাভাবিকত্ব থাকতে পারে; তা সত্ত্বেও তিনি জগতের প্রতি নির্মোহ-দ্রষ্টা হবেন এমনটা আশা করাই যায়। বাংলাদেশের সমকালীন ঔপন্যাসিকের রচনায় এ দেশের

সামগ্রিক চিত্র নানা বৈচিত্র্যে ধরা পড়েছে। প্রশাসন ও রাজনৈতিক সত্যকে ঔপন্যাসিকেরা এড়াতে পারেন নি। বরং কখনও কখনও তা প্রধান অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রশাসনিক অস্বচ্ছতা, আমলা-রাজনীতি, দুর্নীতি, স্বার্থবিদ্ধ রাজনীতির প্রতিক্রিয়া, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিপর্যয় ইত্যাদি বিষয় সমকালীন উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসেবে এসেছে। উন্নয়নশীল বিশ্বের দরিদ্র রাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক শোষক ও দেশীয় প্রশাসনের সম্মিলিত ক্ষমতায়ন কৌশল তথা বৃহত্তর রাজনীতিক-বাণিজ্যিক স্বার্থের বিষয়টিও গুরুত্ব পেয়েছে। অসুস্থ রাজনীতির ফলে সাধারণ মানুষ এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জীবনে ক্রমশ বেড়ে চলা সমস্যা, অশান্ত-সংকটগ্রস্ত মনের বৈচিত্র্যিক প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে। আবার সমকালীন আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক বাস্তবতায় বিপর্যস্ত সাহিত্যিকের মন অতীত থেকে নির্বাচন করেছে সমাধান-প্রয়াসী অনুষঙ্গ। এ পর্যায়ে বিপুল অন্ধকারে উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করেছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। সেই দুঃসময়ের স্মৃতিচারণ কিংবা মুক্তিযুদ্ধকে বর্তমান সংকটের সমান্তরালে রেখে উপস্থাপন করেন সাহিত্যিকেরা। একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের গতিশীলতা ব্যাহত হয় যেসব বাধার কারণে, সেইসব সংকট-বিপদ-জটিলতাসমূহ আবারও নতুন করে দেশকে বিরাট স্থবিরতার সামনে দাঁড় করাতে পারে, নব্য সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থায় জাতিক-আন্তর্জাতিক যেকোনো সংকটে দেশ আরেকটি যুদ্ধের সম্মুখীন হতে পারে — এই গুরুত্বপূর্ণ বার্তাটি স্পষ্ট করাই সাহিত্যিকের উদ্দেশ্য। সুতরাং মুক্তিযুদ্ধকালীন পরিবেশ গল্পে-উপন্যাসে নানা শ্রেণির চরিত্রের মধ্যে রূপায়ণ করার অর্থ কেবল অতীতচারণ ও গৌরবকে তুলে ধরাই নয়, বর্তমানকে ব্যাখ্যা করারও একটা উৎকৃষ্ট পন্থা।

এছাড়া সমকালে বেশ কিছু আঞ্চলিক উপন্যাস রচিত হয়েছে। সেই আঞ্চলিকতার অর্থ ঐতিহ্য ও স্বাদেশিকতার অনুসন্ধান, এটি বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি চেতনা ও দৈশিক বোধ থেকে উৎসারিত হয়েছে। আঞ্চলিক জীবনপটে মানুষের অস্তিত্ব সংগ্রামের আবহমান সত্যের রূপায়ণ বাংলাদেশের উপন্যাসের এক সমৃদ্ধ প্রবাহ। এসব উপন্যাসেও রাষ্ট্রীয় ভাঙাগড়া, রাজনৈতিক পরিবেশ, প্রশাসনের চিত্র অনিবার্যভাবেই প্রসঙ্গ হিসেবে এসেছে, কেননা বাংলাদেশের আঞ্চলিক জীবন বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় জীবনকাঠামোর সাথে যুক্ত।

বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকেরা মধ্যবিত্ত মানসের বিচিত্র প্রবণতাকেও উপন্যাসে রূপদান করেছেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্ফীতি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ শ্রেণির সংশ্লিষ্টতা, আর্থ-উৎপাদন কাঠামোর গুণগত অপরিবর্তনশীলতায় মধ্যবিত্তমানসের বিচিত্র জটিলতার সম্মুখীন হওয়া — এসব বিষয় ঔপন্যাসিকেরা ধারণ করেছেন। প্রশাসন ও রাজনীতির অনুসন্ধানও এই প্রেক্ষাপটেই বিচার্য। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য কথাসাহিত্যিক হলেন — সৈয়দ শামসুল হক, হাসান আজিজুল হক, সেলিনা হোসেন, রাবেয়া খাতুন, মঞ্জু সরকার, হরিপদ দত্ত, হুমায়ূন আহমেদ, মুহম্মদ জাফর ইকবাল, রাহাত খান, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, আনোয়ারা সৈয়দ হক, মঈনুল আহসান সাবের, ইমদাদুল হক মিলন, আনিসুল হক, নাসরীন জাহান, হরিশংকর জলদাস প্রমুখ। উল্লিখিত ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে বাংলাদেশের নাগরিক জীবন, আধুনিক মানুষের সুখ-দুঃখ সংকট-মূল্যবোধের ধরন, জীবন-যাপনের সংস্কৃতি, সর্বোপরি রাজনীতি-সমাজ-রাষ্ট্র কাঠামোয় ব্যক্তির যাপিত জীবনের অখণ্ড

রূপ দেখতে পাওয়া যায়। সমকালীন ঔপন্যাসিকেরা উপন্যাসের বিষয়বস্তু প্রণয়নে সাফল্যের পরিচয় দিচ্ছেন, আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও তাঁরা প্রাতিস্বিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

গ.

সৈয়দ শামসুল হকের (জ. ১৯৩৫) *সন্ধ্যাকাল* (২০০৯) প্রকৃতিগতভাবে রাজনৈতিক উপন্যাস নয়, তবে শিল্পসাহিত্য সমাজ-রাজনীতি এবং লেখকের অবস্থানসত্যের বাইরে কেবল কল্পনামাত্র (fiction) হতে পারে না। বৃহৎ এক নানামুখী বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের মালিক, যিনি নারী সংগঠনেরও প্রতিষ্ঠাতা তার আত্মজীবনী লেখাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে। উপন্যাসের প্লটে লেখক তাঁর বিশেষ শিল্প প্রকৌশলে গেঁথে দিয়েছেন বাংলাদেশে নব্য প্রতিষ্ঠিত পুঁজিবাদ অর্থাৎ যা কিছু পুঁজি ও পরিবর্তনের অংশ; সেই সাথে পুঁজিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নব্য ব্যবসায়ীগণ ক্ষমতাধর মন্ত্রী-এমপিকে হাত করে, প্রয়োজনে প্রশাসনের নানা জায়গায় ঘুষ দিয়ে, ঋণ খেলাপ করা, সমাজে প্রতিপত্তি পাওয়া মানুষ, যারা নিরেট স্বার্থবিদ্ধ জীবন-যাপন করে, যাদের বেড়ে ওঠার পথ লোভ-লালসায়। প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় আকীর্ণ সেইসব মানুষের একজনকে বেছে নিয়েছেন ঔপন্যাসিক। জীবনের গোপন অন্ধকারের ইতিহাস এড়িয়ে বিশুদ্ধ আত্মজীবনী লেখা যার একটা বিলাসিতা, প্রতিষ্ঠিত মানুষ হিসেবে প্রচার পাওয়ার লোভী মাধ্যম মাত্র।

ঔপন্যাসিক কেন্দ্র-চরিত্র মধ্যবয়স্ক নুরুল ইসলামের স্মৃতিতে পূর্বজীবন বর্ণনা করেছেন, পুরো উপন্যাসে নুরুল ইসলামই একমাত্র ক্রিয়াশীল চরিত্র, বাকিরা চলৎশীল থেকেছে তাঁর মনে, স্মৃতিচারণে, ফিরে দেখায়। উপন্যাসের শুরুতে একজন প্রতিষ্ঠিত ধনী ব্যবসায়ী ও বহু কোম্পানির বাণিজ্য-ঐরাবতকে দেখা যায়, কিন্তু এই বাণিজ্যপুরীর মালিক নুরুল ইসলাম একদিনে হন নি, এর পেছনে রয়েছে লম্বা ইতিহাস। কলকারখানা, ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের সম্ভাবনাময় দেশে বাণিজ্যই তাকে বরাবর আকর্ষণ করেছে, কিন্তু সেটা সোজা পথে হবার নয়। দাপুটে মন্ত্রীর বাড়িতে আসা-যাওয়া, ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হিসেবে ব্যাংক লোনটা তার সুপারিশে পাওয়া, ঋণের দ্বিতীয় কিস্তি থেকে মন্ত্রী সাহেবকে ভাগ দেওয়া এভাবে শুরু। প্রতিষ্ঠার পরে পথটিও সমান কৌশলের, কারণ তখন ইনকাম ট্যাক্স, ঋণ খেলাপ সামলে সামনে এগিয়ে যেতে হবে, সেজন্য যা করার তাই করেছেন নুরুল ইসলাম ঔপন্যসিকের বর্ণনায় :

> নিজের বাণিজ্য সাম্রাজ্য গড়ে তোলার যুদ্ধে... ষড়যন্ত্র আছে, গোপন বৈঠক আছে, ফাইল গায়েব করা আছে। সরকারি সিদ্ধান্তগুলো প্রকাশের আগেই জেনে যাবার গোয়েন্দাগিরি আছে। লক্ষ লক্ষ টাকার নোট আছে। ফরেনে গোপন এ্যাকাউন্টে ডলারে ঘুষ দেবার নিঃশব্দ কারবার আছে। (শামসুল, ২০০৯ : ৮৩)

সমগ্র আমলাতন্ত্রে দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে বলেই 'ফাইল গায়েব' করে সরকারি সুযোগের অপব্যবহারে স্বার্থ হাসিল করা সহজ হয়েছে ঘুষদাতার পক্ষে। কেবল আমলাপক্ষকে হাসিল করাই নয়, দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক দফতরগুলো আয়ত্তে না আনলে অবৈধ বাণিজ্য-সাম্রাজ্য গড়া যায় না, উপন্যাসে নুরুল ইসলামের কর্মকাণ্ডও এর

ব্যতিক্রম নয়। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সাথে ক্রমাগত আপস, আদর্শের দ্রুত বদলও এর অংশ, তাই "বদলে যাওয়া রাজনৈতিক দৃশ্যপটেও ঠিকই তিনি নিজেকে বহাল রাখতে পেরেছেন আগের জায়গায়। শুধু যুদ্ধে কৌশলটা বদলাতে হয়েছে। পাঞ্জা নয়, টঙ্কার জোরে তিনি প্রতিপক্ষকে কাবু করেন। দেশে ক্রিয়াশীল প্রধান দুই রাজনৈতিক পার্টিকেই "টাকা দিতে হয় তাঁর। কোন পাত্রে দিচ্ছেন সে খবর তো খতিয়ে দেখার দরকার নেই। সব সরকারের কাছেই তিনি ঋণখেলাপি। সব সরকারের কাছেই তাঁকে নতুন প্রজেক্টের নথি পেশ করতে হয়।" আড়াইশ কোটি টাকার খেলাপি ঋণটাও তিনি অনায়াসে রিশিডিউল করাতে পারেন গভীর রাতে। করাপশনের চার্জে গ্রেফতারের পরোয়ানা এলেও তা স্থবির হয়ে যায়, "তাঁর কাছে সুবিধাপ্রাপ্তরা নিজের গরজেই ওয়ারেন্ট পালিশ করে ফেলে।" তাই আত্মজীবনীতে বিরাট মিথ্যার ঘোষণা দিতে মানসিক প্রস্তুতি নেন তিনি —

> আর কোনো পথ না পেয়ে, বাংলাদেশে সব শালাই চোর, চোরের দলে আমাকেও ঠেলে দেয়ার ষড়যন্ত্র করা হয়। আমার বিরুদ্ধে করাপশন চার্জের এই হচ্ছে আসল কথা। দেয়ার ওয়াজ নো করাপশন। নট অনলি অন দ্যাট অ্যাকাউন্ট। কোনো ক্ষেত্রে কোনো ব্যাপারে আমি কখনোই করাপশন করি নাই। দিস ইস দ্যা ট্রুথ। (শামসুল, ২০০৯ : ১০০)

পুঁজি-নিয়ন্ত্রিত গরিব দেশে এভাবেই বেড়ে উঠেছে দুর্নীতির ইতিহাস, যার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে রাজনীতি, ঔপন্যাসিক এই সত্যটি নিপুণভাবে বিবৃত করেছেন। নুরুল ইসলাম নারী-সংগঠনও করেন তার নিজেরই স্বার্থে। কারণ :

> দান-খয়রাত সাহায্য সহযোগিতা করলে ইনকাম ট্যাক্সের বহরটা কমে আসে। এ বাবদ ব্যয় করা টাকার অঙ্ক আয়ের অঙ্ক থেকে বাদ যায়। এত খবরে পাবলিকের কী দরকার? (শামসুল, ২০০৯ : ৪৯)

ঔপন্যাসিক সৈয়দ শামসুল হক *সন্ধ্যাকাল* উপন্যাসে একজন শিল্প-ব্যবসায়ীর জীবনের তথাকথিত উত্থানের চিত্র এঁকেছেন। এ চিত্রে নুরুল ইসলামের জীবনের সাথে সমান রেখাচিত্রে টেনে দেয়া হয়েছে বাংলাদেশের রাজনীতি ও প্রশাসনের চিত্র, যা ক্রমাগত সাধারণকে করে তোলে আরো সাধারণ আর এইসব বাণিজ্য-কুবের ধীরে ধীরে পরিণত হয় সংখ্যালঘুতে।

রাবেয়া খাতুনের (জ. ১৯৩৫) *দূরে বৃষ্টি* (২০০১) উপন্যাসের কাহিনী এক রাজনীতিবিদের পরিবার ও তাদের জীবন নিয়ে গড়ে উঠেছে। মান্নান মোস্তফা নামের এই ব্যক্তির উত্থান রাজনীতিকে ঘিরেই। যিনি চাকুরি ছেড়ে হয়ে গিয়েছিলেন রাজনৈতিক নেতা, এত দ্রুত রূপান্তর শুরু হয় তখন যেন তা মন্ত্র। ঔপন্যাসিকের ভাষায় :

> ... মন্ত্রই সম্ভবত। যার জোরে পরবর্তী সময় পাল্টে দিতে পেরেছিলেন জীবন এবং পরিবারকে। সেই যে খেয়ালি রাজা, বাবার উত্থানের শুরু তার সময়ে। কোন মেশিনের কোন তেল, ভালো করে রপ্ত করেছিলেন, বড় সাহেব টাইপের কেরাণীর চাকরি ছেড়ে রাজনৈতিক একটি দলে ভিড়লেন। পণ্ডার জায়গা দখল নিতে দেরি হয় নি। খণ্ডিত সময়ে সাংসদ ছিলেন। কেমন করে রাতারাতি তৈরি হয়ে গেল এই অভিজাত এলাকার আলিশান অট্টালিকা। (রাবেয়া, ২০০১ : ৬৪০)

পরিবারের সবাই-ই যে তাদের হঠাৎ উত্থানে স্বস্তিবোধ করে কিংবা খুশি হয় তা নয়। মান্নান মোস্তফার ছেলে আরিয়ান তাদের একজন। সে জীবনের প্রতি এবং কর্মের ব্যাপারে একনিষ্ঠ ও সৎ। তাই বিসিএস পুলিশে যোগ দিয়ে সত্যিকারের পুলিশ অফিসার হওয়ার স্বপ্ন ও চেষ্টা ছিল তার। সে তা পারছিল কিন্তু সহিংস রাজনীতির শিকার হয়ে তাকে শেষ পর্যন্ত মারা যেতে হয়। মান্নান মোস্তফা অবশ্য ছেলে আরিয়ানের সৎ পুলিশ হওয়াকে সমর্থন করেন নি, কেননা এটা তাঁর চর্চিত অভ্যাস-আদর্শের সাথে খাপছাড়া হয়েছিল। ছেলের সাথে এ নিয়ে তার দ্বান্দ্বিক কথোপকথনও হয়েছে, উপন্যাসে অনেকবার তা দেখা যায়; তিনি যে অসৎ রাজনীতিবিদ এবং প্রশাসন-ব্যবস্থা যে তার বা তাদের আয়ত্তে এটা তিনি জানেন, তাই সমস্ত পুলিশ প্রশাসনকে অভিযোগ করে তিনি পুত্র আরিয়ানের সাথে দ্বান্দ্বিক তর্ক করেন; তাকে ব্যঙ্গ করে নিজের ব্যাপারে ইঙ্গিত করে বলেন :

> – রাষ্ট্রীয় বীর পুরুষের প্রথম অভিযান কি এ বাড়ি থেকে শুরু হবে নাকি?
> – কখনো হতেও তো পারে। যা মোটেও কাঙ্ক্ষিত নয়।
> – ... দাগি বাড়ি কি ঢাকা শহরে কম গজিয়েছে! সেগুলো শুদ্ধিকরণ কি তোর কর্ম? জানো সাধ করে যে এলাকায় ঢুকলে তার নেটওয়ার্ক কী পরিমাণ বিশাল। আর যাদের সঙ্গে কাজ করবে মুদ্রার বিনিময়ে সেই পুলিশদের ফুলিস বানান যায় কতো সহজে। খেলানো যায় যেমন খুশি তেমনি। কেনাও যায় সামান্য চেষ্টায়। (রাবেয়া, ২০০১ : ৬৩৯)

মান্নান মোস্তফার মুখে এ উক্তি মানানসই। কেননা তার এ উক্তিতে ইঙ্গিত করা ঘুষ-দুর্নীতির জগতের তিনিও একজন। অন্যকে না ঠকিয়ে তিনি এ পর্যায়ে আসতে পারেন নি। তিনি একটি সংবাদপত্রের এডিটর। তার উত্থানকে আরিয়ানের মনে হয়, 'ইবলিসের লীলাখেলা।' সে জানে, তার বাবার সম্পাদিত 'নতুন খবর' পত্রিকার কাটতি খুব একটা নেই। "কিন্তু ডাটিয়াল সম্পাদক হিসেবে বাবা গুরুত্বপূর্ণ আপন মহলে। দেন-দরবারির পরিধিও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু নিজের অফিসে তিনি নাকি এক প্রতারক মানুষ। স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা হাতে গোনা। নিয়মিত বেতন টেতন তারাই শুধু পায়। বাকিরা, সাংবাদিকতার লাইনে নতুন আসা ছেলেমেয়েদের তিনি দুহাত বাড়িয়ে আহ্বান করেন, উদার চেহারা খোলেন। কিন্তু আর্থিক ব্যাপারে পরে উদাস একদম। প্রচুর উদ্যম নিয়ে যারা কাজে নামে, একসময় হতাশ হয়ে তারা আপনা থেকে আর কোথাও চলে যায়। এটা নিয়ে মান্নান মোস্তফার কোনো গ্লানি নেই। বরং গর্বিত বেহায়া হাসির রেখা সরু গোঁফের তলায় ফুটিয়ে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য রাখেন, আমি রাস্তা থেকে তুলে এনেছিলাম বলেই ওরা ভালো পত্রিকায় চান্স পাচ্ছে।"

জনাব মোস্তফার সম্পাদিত কাগজ তেমন চালু নয়। বিজ্ঞাপনও নয় চোখে পড়ার মতো, কিন্তু অবস্থা দিন-দিন ফুলে ফেঁপে উঠছে। আরিয়ানের ভাষায়, "রহস্যের কিছু নেই। বেআইনী আলাদিনের প্রদীপ রয়েছে, ইয়োলো জার্নালিজমের ভোজভাজি রয়েছে, রয়েছে পাবলিককে ধোঁকা দেয়ার অক্ষয় ক্ষমতা। বাবারা হচ্ছে এ রাজ্যের কম্প্যুটার জেনারেশনের জাদুকর।" (রাবেয়া, ২০০১ : ৬৪০)। কিন্তু সমাজ কিংবা রাষ্ট্রে রাজনীতি-নিয়ন্ত্রিত মন্দটাই সবকিছু নয়। সমান্তরালে ভালোও থাকে, প্রশাসনে সততার পরিচয় দেন অনেকে।

তবে এরা সংখ্যায় কম। আর বেশিরভাগ সময়ে তাদের সততার কারণেই দুর্ভোগ পোহাতে হয়; কখনও কখনও তা জীবন দিয়েও ঘটে। উপন্যাসে আরিয়ানের বর্ণনায় সেরকম একজন সৎ পুলিশ অফিসারের ট্রাজেডি শোনা যায়, যে ছিল আইনের ক্ষেত্রে দুঃসাহসী এক অফিসার। তাকে মফস্বল থেকে সাক্ষ্য দেবার জন্য ডেকে আনা হয়েছিল। কিন্তু কোর্টে পৌঁছানোর আগেই তাকে খুন করা হয়। "মিডিয়ার স্কুপে সাধারণ লোক জানল কাজটা হাইজ্যাকারদের। আসল মূল নায়ক ওপর মহল। হত্যা করা হবে বলেই সত্যিকারের পুলিশ প্রোটেকশন তাকে দেওয়া হয়নি। ... এভাবে আমরা (পুলিশেরা) হয়েছি কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের এমন কি প্রশাসনের কোনো কোনো মহলের চোখের কাঁটা।" (রাবেয়া, ২০০১ : ৬৫২)। আরিয়ানকেও তার পুলিশি দায়িত্বে অবিচল কর্তব্যের কারণে রাজনৈতিক সংঘর্ষে মারা পড়তে হয়েছে। তার অপরাধ, সে সাংসদের ছেলেকে আটকে রেখেছে। তার রাজনীতিবিদ বাবাও জানতেন জীবনের সততার সু-স্বপ্নগুলো অবাস্তবের কাছাকাছি পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। গুটিকয়েক আদর্শবাদী সৎ অফিসারেরা কিছুই করতে পারবে না বলেছিলেন তিনি আরিয়ানকে। আরিয়ান বলেছিল যে, সময় বদলে যাবে, আমরা বদলাব। কিন্তু সময় বদলানো খুব সহজ নয়। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার সর্বোচ্চ দায়িত্ব যে ক্ষমতাসীনদের তারাই তাদের নষ্ট চারিত্র্য বজায় রাখতে কিংবা জনমানুষকে শোষণের লোভ এড়াতে না পেরে ক্ষমতা ও টাকার বিনিময়ে দখল করে পুরো শাসন ব্যবস্থা। এর খেসারত জনগণকেই দিতে হয়। উপন্যাসে এই সব ভয়ংকর দুর্যোগের নানা খবর আছে। মান্নান মোস্তফার মেয়ে সায়মকে আরেক সাংসদ-মন্ত্রীর ছেলে জায়েন্ট গ্যাং রেপ করে। আরিয়ান তাকে অ্যারেস্ট করলে কোর্ট তাকে রিমান্ডের আদেশ দেয়। সেখানে সে তার অপরাধ স্বীকার করে না। রাজনীতিবিদ সাংসদ পিতা ও নানা গডফাদার ফোন করে আরিয়ানকে হুমকি দিতে থাকে জায়েন্টের জামিনের জন্য। আরিয়ানের সাথে কথোপকথনের এর পর্যায়ে সাংসদ বলে :

> – প্লিস ও যাতে জামিন পায়... পাবে না?
> কিন্তু কি দিয়ে কেস সাজাবেন? ওর কাছে কোনো আগ্নেয়াস্ত্র বা বেআইনী কিছুই পাওয়া যায়নি... রেপ কেস? তার ক্ষতিপূরণ সম্ভব... যে শর্ত দেবেন তাই মানব... কোনো শর্ত নেই কথাও নেই? ... দেখুন হাত কচলে যখন ফল পাওয়া গেল না তখন মনে রাখবেন আমিও সহজ পাত্র নই। আপনাদের বাপের বাপ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে সরাসরি দরবার করব। (রাবেয়া, ২০০১ : ৭০০)

অধিকাংশ রাজনীতিবিদ ও গডফাদারের চরিত্র এর ব্যতিক্রম কিছু নয়, স্বার্থ উদ্ধারের জন্য এরা যা খুশি তা করতে সক্ষম। আরিয়ান বলে, "এরা হচ্ছে জাত বেহায়া, জন্ম থেকে নীতি বিবেক বিবর্জিত অমানুষ।" (রাবেয়া, ২০০১ : ৭০০)। এর পরের পরিণতি আরো খারাপ। পুলিশি রিমান্ডে অপরাধ স্বীকার না করা জায়েন্টের মৃত্যুতে জীবন দিতে হয় আরিয়ানকেও, তার রাজনীতিবিদ ক্ষমতাধর পিতাও তা ঠেকাতে পারেন না; যেমন তিনি ঠেকাতে পারেন নি মেয়ে সায়মের গণধর্ষণের মত নির্মম ব্যাপার। রাজনীতিতে ক্ষমতার পারস্পরিক লড়াই চলে এভাবে। আরিয়ান বুঝতে পেরেছিল দেশের এই রাজনৈতিক পরিবেশ। আক্ষেপ করে সে তাই বলেছিল :

> আজকাল সব ঘটনার পেছনে বড্ড বেশি কালো ছায়া দেখছি। দেশ স্বাধীন হবার পর মেধাবী জেদী আর্মি অফিসারের একটি দল যেন অদৃশ্য অশুভ আঙ্গুলের ইঙ্গিতে একজন একজন করে মারা পড়ছিলেন। ত্রিশ বছরের মধ্যে, বেশি সময় ধরে দেশ থাকল সেনাপ্রধানদের করতলে। পরবর্তী সময়েও এমন কেউ আসে নি, যে দেশকে ভালোবেসেছে, মসনদকে নয়। ফলে দুর্নীতি, সন্ত্রাস বেড়েছে, আর কিছুই নয়। (রাবেয়া, ২০০১ : ৪৫৩)

উপন্যাসের রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও বিরোধী দলের আন্দোলন তথা হরতাল আর তা কেন্দ্র করে জনগণের অসহনীয় দুর্ভোগ অশান্তির কথা আছে। হরতালকে কেন্দ্র করে উঁচু-নিচু সর্বস্তরের মানুষের নানা দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে। বর্ণনাটি বাস্তবতামণ্ডিত :

> গতকাল সরকারি এবং বেসরকারি দুদলের ক্যাডারদের প্রকাশ লড়াই বেধেছিল। নাগরিক নিরাপদ বায়তুল মোকররমের অঙ্গন এবং রাজপথ পরিণত হয়েছিল রণাঙ্গনে; বিপক্ষ দলীয় এক সভা উপলক্ষ করে পুলিশি এ্যাকশনে ধরপাকড়ের সংখ্যা শ' ছাড়ানো। আহত পঁচিশ। নিহত পাঁচ। লাশ নিয়ে উত্তপ্ত স্লোগানে গরম মশাল মিছিল বেরিয়েছিল। বিরোধী প্রতিবাদী দল আচমকা ঘোষণা দিয়েছে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল। প্রয়োজনে আটচল্লিশ ঘন্টাও ছাড়াতে পারে। উত্তেজিত এক যাত্রী চিৎকার করে বললেন, এটা কি মগের মুল্লুক নাকি রে ভাই! দুদলের বিবাদে ধরা খেল সাধারণ মানুষ। আধ মরা, পুরা মরা, তাও তারাই। আবার তাদের নিয়ে যে হরতাল, তারও দুর্ভোগ পোহাতে হবে সাধারণ মানুষকেই। (রাবেয়া, ২০০১ : ৬৩২)

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ঔপন্যাসিক এই বিবরণে সমকালের অব্যাহত রাজনৈতিক চিত্রই সরাসরি তুলে ধরেছেন। বাস্তবতার বাইরে নয় এ বর্ণনা, উপন্যাসের চরিত্র জয়ন্তের মতে — এই সব সরকার ভার্সেস বিরোধী দলের অ্যাকশনের সময় শান্তিপ্রিয় প্রতিটি নাগরিক বিরক্ত ফায়দাহীন হরতালে। দরিদ্র মানুষের যন্ত্রণাই সবচেয়ে বেশি, বিশেষত যারা দিনমজুর, উপন্যাসে তাদের কষ্টের কথা আছে, আছে রিকশাওয়ালা, কুলি, ছোট দোকানির কথা। একজন ফেরিওয়ালা বলে :

> খালি তো হাত পাও ভাঙ্গন না, আইজ কাইল টান দেয় জান ধইরাও। দায় না থাকলে হরকালে ক্যাডা বারাইব সখ কইরা।... ফকিররা হাত পাইতা ভিক্ষা চাইবার পারে। আমরা খুসরা ফেরিওয়ালা, ছুট্ট ছুট্ট দুকানদাররা জব্বর বিপদে পড়ি এই হুগল হরতাল মরতালে। (রাবেয়া, ২০০১ : ৬৫০)

পত্রিকায় চোখ রাখলে বাস্তবতার যেসব খবর পাই আমরা, সামগ্রিক উপন্যাসটি সেই পটেই রচিত হয়েছে। উপন্যাসেও মেয়ে সায়মের ধর্ষণের পর মান্নান মোস্তফার উপলব্ধি :

> এমন কোনো সকাল নেই পাঠকের দৃষ্টিতে ধরা দেয়না, খুন জখম, পাশবিক প্রক্রিয়ায় নরদেহের খণ্ডিত হত্যাকাণ্ড, ধর্ষণ, গাংরেপ। (রাবেয়া, ২০০১ : ৬৯৫)

উপন্যাসটি শেষ হয়েছে রাজনৈতিক দলাদলির ফলে আরিয়ানের নির্মম মৃত্যুশোকের মধ্য দিয়ে। এই মৃত্যুগুলো আমাদের প্রতিদিনকার বাস্তবতারই অংশ।

অসুখ (২০০৬) হাসনাত আবদুল হাই-এর (জ. ১৯৩৯) একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস, যেখানে ভঙ্গুর গণতন্ত্রায়নের পরিণতি, স্বার্থপর প্রশাসন ও সাধারণ জনগণের

অনিশ্চিত ভোগান্তিপূর্ণ জীবনের বর্ণনা রয়েছে। উপন্যাসটির আপাত সংক্ষিপ্ত পরিসরে টুকরো টুকরো পটের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক একটি সমগ্র রূপ তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন। সে রূপ একান্তভাবে আমাদের দেশীয় অন্তঃসারশূন্য রাজনৈতিক কাঠামো ও রাজনীতি এবং প্রশাসনের সংযুক্তির এক অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রতিচ্ছবি। উপন্যাসে বর্ণিত নানা টুকরো বর্ণনার মাঝে রয়েছে যোগসূত্র; আন্তঃসংযোগ। একটি নিষিদ্ধ মালবাহী (হেরোইন, মদ ও অন্যান্য) ট্রাকের গন্তব্যে পৌঁছানো নিয়ে কাহিনীর সূত্রপাত। উপন্যাসে কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন পট উন্মোচিত হয়েছে। যেখানে একদিকে রয়েছে যৌনপল্লি, ফেরিঘাট যা মদ হেরোইনসহ অন্যান্য চোরাকারবারির মূল ক্ষেত্র, একে ঘিরে জড়িত রয়েছে ক্যাডার সন্ত্রাসী, উপজেলা ও জেলা নেতা। আবার অন্য পটে আছে হেরোইন (মায়ানমার থেকে আসা সাদা পাউডার) সাপ্লায়ার ব্যবসায়ী, তার সাথে হাত মেলানো সরকারি আমলা ও জেলা রাজনৈতিক নেতা। আর উপন্যাসের অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে অবরোধকারী কৃষক দল, যারা তাদের বিদ্যুৎ সরবরাহ, ডিজেল আর সারের দাবি নিশ্চিত করতে চায়। সরকার যদিও বলে থাকে জনগণ ক্ষমতার উৎস, তবু সরকারের পুলিশ-সামরিক বাহিনী, আমলাতন্ত্র ও রাজনৈতিক নেতাদের অতিক্রম করে জনগণ সরকারের কাছে পৌঁছুতে পারে না। রাজনৈতিক নেতারা নির্বাচিত হন জনগণের দ্বারাই কিন্তু নির্বাচনি ইশতেহারে দেওয়া প্রতিশ্রুতি তাঁরা পালন করেন না কোনোটিই। সুতরাং দেশের মানুষের প্রয়োজন ও প্রত্যাশা অপূরণই থেকে যায়। জীবনযুদ্ধে ক্লান্ত মানুষেরা কখনও কখনও প্রতিবাদ করে, কিন্তু তা কেন্দ্রে পৌঁছে না জোরালোভাবে। আর তা বিদ্রোহে রূপ নিলে প্রশাসনের চোখে সেটা হয় বাড়াবাড়ি, ফলে প্রতিবাদকারীকে জীবনও দিতে হয় কেন্দ্রীয় হুকুমের তাবেদার তথাকথিত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক হলেও রাজনীতিবিদেরা সৎ ও যোগ্য প্রার্থী হিসেবে কিংবা দেশের জনগণের প্রতি একনিষ্ঠ হতে একেবারেই অক্ষম, উপন্যাসে সে ইঙ্গিত আছে। সমাজ বদলানো কিংবা দেশের উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতাগুলো কী কী তা বলা হয়েছে এভাবে :

> নির্বাচনে অনেক আপস। চোরাকারবারিদের সঙ্গে, লুটেরাজের সঙ্গে গডফাদারদের সঙ্গে, কালো টাকার মালিকদের সঙ্গে। এত আপস করে সমাজে বিপ্লব আনা যায় না। (হাসনাত, ২০০৬ : ২০৭)

এভাবে অস্থিতিশীল রাজনীতি ও দুর্নীতিযুক্ত প্রশাসনের কারণে জন্ম নেয় জঙ্গিবাদ, যারা সমাজ পরিবর্তনের ভ্রান্ত বিশ্বাসে ও পন্থায় সৃষ্টি করে নতুন অস্থিরতা। উপন্যাসের অপর প্রান্তে হেরোইন সাপ্লায়ার ব্যবসায়ী রহমান সাহেবের বাড়ির ভেতরে আক্রমণ ও সেখানে বোমা তৈরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ সত্য উন্মোচিত হয়। টাকাওয়ালা ব্যবসায়ীর সুরাপান, স্বামী-স্ত্রীর কপট সম্পর্ক, কুটিল স্বার্থপরতায় নেতা আমলার সাথে যোগ, অঢেল টাকায় উচ্ছন্নে যাওয়া ব্যবসায়ীর ছেলেমেয়ে ইত্যাদি চিত্র অস্থিতিশীল পরিবেশেরই অংশ। একটি দেশের জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ রাজনীতি-নিয়ন্ত্রিত দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসনের কারণেই প্রধানত বাধাগ্রস্ত হয়। দেশীয় বিত্তধারীদের উৎপাদনের খাতে অর্থ বিনিয়োগের কোনো সুযোগ থাকে না। স্বাভাবিকভাবেই তারা ভোগ বিলাসিতার দিকে ঝুঁকে পড়ে, এভাবেই

দেখা যায় যৌনতা ও সুখদ বিষয় অঙ্গ হয়ে ওঠে তাদের জীবনযাপনের। অবৈধ ও অনৈতিক সম্পর্কের ভেতর দিয়ে শুরু হয় ব্যক্তি ও সমাজের পচন। হাসনাত আবদুল হাই এ বিনষ্ট সমাজ ও দেশের নানা অন্ধকারকেই নাম দিয়েছেন 'অসুখ'।

রাহাত খানের (জ. ১৯৪০) *রাজনীতির সুখ-দুঃখ* (২০০৬) সমকালীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবেশের একটি স্বচ্ছ দর্পণ। একজন উঠতি ধনী ব্যবসায়ী যার রয়েছে সিঙ্গাপুরের শেয়ার বাজার থেকে প্রাপ্ত কয়েক মিলিয়ন ডলার, ঢাকার গুলশানে কমার্শিয়াল টাওয়ার, এলিফ্যান্ট রোডে একটা ব্লক মার্কেট এবং গুলশানে সাড়ে তিন হাজার স্কয়ার ফিটের ফ্ল্যাট। জাতীয় নির্বাচনে তার অংশগ্রহণ করার জন্য নমিনেশন পাওয়া নিয়ে উপন্যাসের কাহিনী বেড়ে উঠেছে। কিন্তু রাজনীতি করা, পার্লামেন্টে যাওয়া, মন্ত্রিত্ব বাগানো, প্রশাসনকে হাত করা — এককথায় ক্ষমতা দখল যে কতটা কষ্টসাধ্য বাংলাদেশের সমকালীন পরিস্থিতিতে ঔপন্যাসিকের ভাষ্য সেটাই। উপন্যাসের নানা চরিত্রের সৃষ্টি ও উক্তির মধ্য দিয়ে বর্তমানের রাজনীতির চালচিত্র নানা রূপে ধরা পড়ে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হাসান আবদুল্লাহর চোখে রাজনীতির সত্যটা হল :

> ... নব্বইয়ের দশকে রাজনীতি খুব কঠিন আর জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনীতি মানে এখন শুধু বক্তৃতা দেওয়া নয়। শুধু ভোটাভুটি নয়। এখনকার সময়ে রাজনীতি মানে দরকার হলে ভোটের বাক্স ছিনতাই করা, প্রতিপক্ষের জনসভায় বোমা হামলা করা, সন্ত্রাসী লেলিয়ে দেওয়া বিরোধী নেতা ও ভোটারদের পেছনে। রাজনীতি এখন একটু অন্য রকম। এই রাজনীতিতে নেতার যোগ্যতা থাকা, এমনকি জনপ্রিয়তা থাকা সব নয়। এখনকার রাজনীতিতে ঠাঁই করে নিয়েছে পাজেরো, জিপ। গুচ্ছ গুচ্ছ টাকা, একে-৪৭। নির্বাচনী নীল নকশা, আরও কত কী! একটা সময় ছিল শুধু জনগণ সঙ্গে থাকলেই হতো। নিশ্চিত হতো নির্বাচনী বিজয়ে। এখন সেটা হয় না। এখন জনসমর্থন ছাড়াও এমপি হওয়া যায়। বাক্সে ভোট পড়ুক চাই না পড়ুক, ইসি শুধু ঘোষণার সময় তার নামজারিটা করে দেবেন। (রাহাত, ২০০৬ : ১০৭)

নির্বাচনে জয়ী হওয়ার আরো কিছু উপযোগিতা আছে। যেমন— মিডিয়ার সমর্থন। কারণ :

> রাজনীতিতে ভালো করতে গেলে ভালো পত্রিকার সমর্থন বা কভারেজ চাই। (রাহাত, ২০০৬ : ১০৭)

এছাড়া এক্ষেত্রে জয়ের অন্যতম প্রধান নিয়ামক হল টাকা, প্রবীণ রাজনৈতিক নেতা হাসান আবদুল্লাহর নমিনেশন পাওয়া প্রসঙ্গে উক্তি করেছে :

> ... এখন রাজনীতিতে বড় ফ্যাক্টর হইল দলের ওপর মহলের সঙ্গে লিংক আর টাকা। বিশেষ কইরা টাকা। টাকা কিন্তু পলিটিক্সে একজন অপরচিত লোককেও পরিচিত কইরা তুলতে পারে। নন-পলিটিক্যাল ইলিমেন্টকে ফাস্ট চান্সেই মন্ত্রী কইরা দিতে পারে এই টাকাই। (রাহাত, ২০০৬ : ১১৭)

জাতীয় নির্বাচনে নমিনেশন পাওয়া নিয়ে তার সাথে বিরোধ দেখা দেয় উপন্যাসের অপর চরিত্র মিরাজউদ্দিনের সাথে। মিরাজউদ্দিনও সমান পরিমাণ টাকা ঢেলে, বড় বড় নেতাদের হাত করে নমিনেশন পেতে চায়। হাসান আবদুল্লাহকে শেষ পর্যন্ত আপস করতে হয় তার কাছে। বামপন্থী রাজনীতিও ধীরে ধীরে কী করে ব্যর্থ হয় টাকার রাজনীতির কাছে তা প্রতীকায়িত হয়েছে এ

উপন্যাসের তাহেরী চরিত্রের মাঝে। একসময় ছাত্র ইউনিয়ন করা তাহেরী সবকিছু ছেড়ে স্বার্থপর রাজনীতিতে যোগ দিয়েছে, তার দৃষ্টিতেও রাজনীতির আর এক সত্য প্রতিভাত হয় :

> আবদুল্লাহর ওপর তাহেরীর একটাই ক্ষোভে। লোকটা অমানুষদের রাজনীতি করতে এসেছে কেন? পার্লামেন্ট মেম্বার হয়ে সে কী করবে? ...ছাত্রজীবনে সে (তাহেরী) ছিল ছাত্র ইউনিয়নের সদস্য। পরে বিপ্লবীদের দলে যোগ দিয়েছিল। বাংলাদেশের রাজনীতির মতো সেও এক বিচিত্র জগৎ। দলাদলি, গুপ্ত খুন, ডাকাতি, নারী ধর্ষণ... কোনোটারই কমতি নেই সেখানে। তাহেরী বছর কয় আগে বাড়ি চলে এসেছে সব ছেড়েছুড়ে। ভুলেও কখনও সেই আন্ডারগ্রাউন্ড রাজনীতি নিয়ে কথা বলে না। তবে রাজনীতি নিয়ে তার একটা স্বপ্ন ছিল বৈকি। সেটা দেখতে দেখতে এখন ক্ষোভে পরিণত হয়েছে। (রাহাত, ২০০৬ : ১২২)

রাজনীতির সুখ-দুঃখ বিষয়বস্তুর দিক থেকে বড় পরিসরের উপন্যাস। কেবল সময়ের রাজনীতির চিত্রই নয়। একই সাথে এ উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে বিকৃত সময়ের সঙ্গে লড়তে থাকা কিছু মানুষের জীবনও; যারা নিষিদ্ধ জগতের বা আন্ডারগ্রাউন্ডের লোক বলে পরিচিত। তেমনই একজন মানুষ রমলা ও তার প্রমোদকুঞ্জে আসা মানুষজন। পানশালা, জুয়ার আড্ডা এমনকি রান্ডিখানা — সবই আছে রমলার প্রমোদকুঞ্জের ন'তলা-দশতলায় :

> পুলিশ প্রশাসন সবাই এই প্রমোদকুঞ্জের খোঁজ রাখে। তারা নিয়মিত মাসোহারা পায়। উপরি হিসেবে তারা আরও কিছু কিছু পায়। আজ পর্যন্ত রমলা আন্টির অঘোষিত প্রমোদকুঞ্জ নিয়ে কোনও বিপদ হয় নি। (রাহাত, ২০০৬ : ১১২)

শেষ পর্যন্ত পুলিশ-প্রশাসনেরই ছত্রচ্ছায়ায় পুরনো প্রেমিককে খুন করে রমলা, সেই সাথে কুসুম নাম্নী হেরোইন ব্যবসায়ীকেও। এরপর রাজনৈতিক নেতা মিরাজউদ্দিনের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত এই আন্ডার গ্রাউন্ড ব্যবসায়ী রমলা রূপান্তরিত হয় ফাতেমা খাতুনে। মিরাজউদ্দিন তারই স্বার্থে তাকে এভাবে প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু একসময় বাধ্য হয়ে রমলা পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে। সে স্বীকার করে এক শৃঙ্খলাবদ্ধ নিষিদ্ধ জগতকে, রাজনীতি ও প্রশাসন যার বড় একটা অঙ্গ। সে স্বীকার করে :

> হত্যা কোনো কিছুর মীমাংসা নয়। কুসুম এবং সুলতানের পর তৃতীয় ব্যক্তিটিকে খুন করলে বাঁচার জন্য তাহলে আরও একজনকে মারতে হতো তাকে। নতুবা চতুর্থ ব্যক্তিটি সুযোগ খুঁজছে, সেই রমলাকে একদিন না একদিন ঠিক মেরে ফেলতো। (রাহাত, ২০০৬ : ১৩৬)

সুতরাং রাজনীতি বা প্রশাসন শেষ পর্যন্ত কাউকেই আশ্রয় বা মুক্তি দিতে পারে না। হাসান আবদুল্লাহকেও তাই এই রাজনীতির উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে নিজেকে সরিয়ে আনতে হয়।

সেলিনা হোসেনের (জ. ১৯৪৭) *মর্গের নীল পাখি* (২০০৫) সাম্প্রতিক দেশ-কাল-চিত্র সংবলিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। উপন্যাসবিধৃত চরিত্রগুলোর মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে সাধারণ মানুষের যাপিত জীবনের বঞ্চনার নানা চিত্র উঠে এসেছে। পুরো রাষ্ট্র একটা মর্গের রূপে প্রতীকায়িত এখানে। অস্তিত্বগত যে সংকট নিম্নবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত কিংবা মধ্যবিত্ত ক্রমাগত অনুভব করে, সেই প্রান্তিকতার চিত্রায়ণ একজন সত্যসন্ধ শিল্পীর পক্ষে মর্মান্তিক হলেও সত্য প্রকাশের ভয়াবহতাকে এড়িয়ে শিল্পীর দ্বারাই প্রকাশের নিশ্চয়তা রচিত হয়। উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র শুদ্ধ কয়েক বাক্যে সাধারণ মানুষের অস্তিত্ব-সংগ্রাম ও শেষপর্যন্ত অস্তিত্বহীনতার নিরেট সত্য জানিয়ে দেয় :

> বরাবরই মনে হয় এই দেশটা একটা মর্গ হয়ে গেছে, আমরা সেই ঘরের লম্বা টেবিলে শায়িত। আমরা মরছি বুলেটে, ছুরিতে, লাঠির আঘাতে-অন্ধকারে কিংবা দিনের বেলায় — আমাদের ঝাঝরা শরীর চিরে ফাঁক করার জন্য জায়গা খুঁজে পায় না ডোমেরা — আমাদের শরীর পঁচতে থাকে, পঁচা মাংস খসে পড়তে থাকে দুর্গন্ধ, ভীষণ দুর্গন্ধ গোটা দেশের বাতাস। (সেলিনা, ২০০৫ : ২২)

রাজনৈতিক দলগুলোর ক্যাডারভিত্তিক তথা জোর বা শক্তি প্রয়োগমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতি বা রাজনীতি চর্চা দেশে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, হত্যাকাণ্ড, অপরাধের হার ক্রমেই বাড়িয়ে তোলে। আর এ রূঢ় বাস্তবতা প্রকাশ পায় শুদ্ধের বর্ণনায়, যখন সে পারভিন নামক তার এক বন্ধুকে সন্ত্রাসীদের হাতে খুন হতে শোনে এবং পরে তার লাশ বাবা মায়ের সামনে বেওয়ারিশ বলে রিপোর্ট লিখে হাসপাতালের বেওয়ারিশ লাশের ঘরে ফেলে রাখতে দেখে। শুদ্ধের বর্ণনা :

> এই খাঁটি সত্যই এখন এই মুহূর্তে বাংলাদেশের রিয়ালিটি, আমরা সবাই সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি। আমাদের নিয়তি মর্গের ওই ছয় ফুট লম্বা টেবিলটা। একসময় ওই ডোমরাও থাকবে না আমাদের শরীর দু'ফাঁক করার জন্য। (সেলিনা, ২০০৫ : ২৩)

সন্ত্রাসীদের হাতে খুন হওয়া পারভিনের পিতা-মাতা বাধ্য হয়েছিল তাদের মেয়েকে বেওয়ারিশ লাশ হতে দিতে কেননা যেসব সন্ত্রাসীর দ্বারা সে খুন হয়েছিল তারা রাজনৈতিক নেতাদের মদদে বেড়ে উঠেছে। এ পর্যায়ে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের কুক্ষিগত পুলিশ প্রশাসনকেও নীরব ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। ফলে পারভিনের মত শত শত সাধারণ নাগরিকদের হতে হয় বেওয়ারিশ লাশ এবং বঞ্চিত হতে হয় সেসব মৃতের পরিবারকে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইনের শাসনের অন্যতম প্রধান মূলনীতি 'আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান', যেন এক ব্যঙ্গোক্তিতে পরিণত হয়। শুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় সেই তিক্ততা ঝরে পড়ে তীক্ষ্ণ ব্যঞ্জনায় :

> আহ্ পারভিন! আমরা তো জানি তুমি ক্লান্ত ছিলে না, তোমার অফুরন্ত উৎসাহ ছিল, আনন্দকে সাবানের ফেনার মত দুহাতে মাখতে, তবু তোমাকে যেতে হলো সেই লাশকাটা ঘরে, কবি যার ব্যাখ্যায় বলেছেন, যেখানে ক্লান্তি নেই — এই ক্লান্তিহীন পরিবেশ তোমার জন্য ছিল না। যারা তোমাকে ওখানে পাঠিয়েছে ওটা তাদেরই প্রাপ্য ছিল। কিন্তু এই রাষ্ট্র তাদেরকে খুব কমই শাস্তি দেয়, পারভিন, দুর্ভাগ্য ! দুর্ভাগ্য আমাদের, দুর্ভাগ্য আমাদের সবার। (সেলিনা, ২০০৫ : ২২)

রাজনৈতিক অপসংস্কৃতি, প্রশাসনের রাজনীতিকরণ (politicization) ও প্রশাসনিক দুর্নীতির আরো চিত্র আছে মর্গের ডোম প্রাণেশের সঙ্গে শুদ্ধের আলাপচারিতায়। শুদ্ধ মর্গের লাশের রিপোর্ট লেখা এবং লাশ আত্মীয়ের হাতে তুলে দেয়া প্রসঙ্গে মর্গের ডোমেদের দোষী বলে অভিযোগ করলে প্রাণেশ সে মন্তব্যের বিরোধিতা করে বলে :

> বাজে কথা বলবেন না স্যার। ডোমেদের ঘাড়ে দোষ চাপানো সহজ তো! সেজন্য এত কথা হয় আমাদের বিরুদ্ধে। হাঙ্গামা হয় পুলিশ কেসে। ওরাই ঝামেলা করে বেশি। ওদের কাগজপত্র ঠিক করতে দেরি হয়। ইচ্ছা করে হয়রানি করে, একদিনের কাজ করতে পাঁচদিন লাগায় এইসব। (সেলিনা, ২০০৫ : ৩৫-৩৬)

উপন্যাসে নিষ্পেষিত সাধারণ মানুষের খণ্ড চিত্র আছে। মারেফা বুয়া সন্ত্রাসীদের হাতে গণধর্ষণের স্বীকার হওয়ার পর সাংবাদিক প্রমিতা তার বান্ধবী রোজিনার সাথে এ নিয়ে কথা বলে :

> আর বলিস না। বুয়া তো এখন পর্যন্ত উঠতেই পারছে না। আসল উদ্দেশ্য অন্যরকম। বুয়াকে উৎখাত করে তার ভিটে দখলের পায়তারা করছে সন্ত্রাসীরা। কে তাকে বাঁচাবে? কেউ নাই। পুলিশ না প্রশাসনও না। সব লুটেরার দল। (সেলিনা, ২০০৫ : ৪১)

উক্তি থেকে এটিই স্পষ্ট হয় যে, জনসাধারণের মনে নিরাপত্তা কর্মী তথা জনস্বার্থ রক্ষক পুলিশ ও প্রশাসনের প্রতি আস্থা নেই, ভরসাও নেই। এরকম নিয়ত অন্ধকার ঔপন্যাসিকের বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিকোণে মানুষের ক্রমাগত জীবন-সংগ্রামের অনুষঙ্গে বাস্তবিক হয়ে উঠেছে। সীমাবদ্ধ মানুষকে আরো সীমাবদ্ধ করে দেয় স্বার্থবিদ্ধ কেন্দ্রীয়-প্রান্তিক রাজনীতি। এভাবে বহির্জীবন ও অন্তর্জীবন উভয় ক্ষেত্রেই নিঃসঙ্গ-নিঃস্ব-রিক্ত হয়ে পড়ে মানুষগুলো। রাজনীতিবিদের পালিত সন্ত্রাসীরা বিরোধী একজনকে খুন করে অনায়াসে লাশ টুকরো করে, মর্গের ডোম প্রাণেশকে টাকার বিনিময়ে নিজেদের করে নেবার পরেও নিরাপদ বোধ না করায় তাকেও খুন করার প্রয়োজন হয়। প্রাণেশের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর শুদ্ধের স্ত্রী বিম্ববতীর ক্রোধ ও ক্ষোভের ভেতরে রূপায়িত হয় অদ্ভুত স্বদেশ :

> বিবেকহীন নিয়ন্ত্রণহীন এ কেমন স্বদেশ আমার! মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে জিম্মি হয়ে গেছে ছাপান্ন হাজার বর্গমাইলের বিশাল জন অধ্যুষিত ছোট্ট ভূ-খণ্ড। (সেলিনা, ২০০৫ : ১৯৪)

স্ত্রী বিম্ববতীর এ ভাবনার প্রতি উত্তরে শুদ্ধ বলে :

> ইমোশনাল হবে না বিম্ব। যারা হত্যাকাণ্ড ঘটাবে তাদের কাছে নীল পূর্ণিমা বলে কোনো শব্দ নেই। ওরা চেনে ক্ষমতা, ওদের আছে লোভ, আছে দম্ভ। মানুষের জীবনের মূল্য ওদের পায়ের কড়ে আঙ্গুলের সমানও না। (সেলিনা, ২০০৫ : ১৯৬)

শোষণ-বঞ্চনা-অত্যাচার শৃঙ্খলিত সমকালের প্রতি এই সরব অথচ অর্থহীন প্রবল ঘৃণা যদিও প্রান্তিক মানুষের স্বার্থ উদ্ধারে অনুকূল নয়, তবে ঔপন্যাসিকের চেতনামূলে ক্রিয়াশীল এই অনুভব সমাজ-রাষ্ট্র চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে জাগিয়ে তোলে এক সময়-সতর্কতা। সমাজপটের বিচারে এর মূল্য গৌণ নয়।

রাজনীতিবিদগণ (১৯৯৮) হুমায়ুন আজাদের (১৯৪৭-২০০৪) একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। আঙ্গিকের দিক থেকেও এটি ভিন্নমাত্রার উপন্যাস, যেখানে বিশেষ কোনো চরিত্রের জীবন কিংবা গল্প নয় বরং একটি দেশের সাধারণ জনমানুষের দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে এ দেশের রাজনীতি, রাজনীতিকদের জীবন এবং জনগণের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি-দুঃখ-দুর্দশা। ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ জনগণের দৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশ থেকে সমকাল পর্যন্ত এই দেশটির রাজনীতি তথা প্রশাসনের একটি চিত্র ধারণ করা হয়েছে জনগণের ভাষ্যে। এটা স্পষ্ট যে, রাষ্ট্রের শ্রেণিচরিত্রের বদল ঘটেনি, মধ্যবিত্ত শ্রেণি মুক্তিযুদ্ধ করেছে যে স্বার্থগত প্রবণতা থেকে তা স্বল্পসময়েই নস্যাৎ হয়েছে। শ্রেণিস্তরে মৌলবাদ বা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির দাপট বেড়েছে। রাজনীতি সমাজের নেতিবাচক অংশগুলোকে নানা উপায়ে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে একনায়কের শাসন, উর্দি শাসন, মৌলবাদী বা প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তির শাসন পুনরায় উদ্ভূত হয়েছে।

বাংলাদেশের সমাজ-বাস্তবতায় মুক্তিযুদ্ধোত্তর যে জীবনাগ্রহ সেখানে বৈশ্বিক বাস্তবতার আগ্রাসী রূপ, তথাকথিত মুক্তবাজার অর্থনীতির দাপট, রাজনীতির নেতিবাচক ব্যবহার কিছু ভূমিহীন উন্মূল চরিত্রের জন্ম দিয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বিপন্ন অস্তিত্বে, ক্ষয়িষ্ণু এবং মূল্যবোধহীন বিনষ্টির সময়ে পতিত। বাংলাদেশের এই ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতি নিয়ে উপন্যাসটি লিখিত। বস্তুত রাজনীতিবিদেরা জনগণের প্রতিনিধিত্বের বদলে নিজেদের স্বার্থপরতা চর্চা করে। এদেশের গণতান্ত্রিক শাসন শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে 'রাজতন্ত্র' বা 'গণতান্ত্রিক রাজতন্ত্র' — যা কেবল একরৈখিকভাবে ক্ষমতা-লিপ্সা, কপটতা-ভণ্ডামি, ক্রমাগত দল/চেহারা পরিবর্তন, স্বার্থান্বেষী মনোভাবের কর্মী তৈরি করা, ক্যাডারভিত্তিক রাজনীতি, ক্ষমতা ও টাকার পরিমাণে মনোনয়ন ও পদ দখলকেই প্রমাণ এবং নিশ্চিত করে। ঔপন্যাসিক স্বাধীনতা-পরবর্তী রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষমতায়ন ও তাদের কর্মকাণ্ডের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি এদের নাম দিয়েছেন রাজবংশ। যেমন— 'শক্তির উৎসবাদী গণতান্ত্রিক রাজবংশ বা দল', যারা ভাবে, জনগণ হচ্ছে শক্তির উৎস আর তারা শক্তির পরিণতি। আবার আরেকটি রাজবংশ হল — 'জনগণমন গণতান্ত্রিক রাজবংশ বা দল'। "এই রাজবংশ মনে করেন তাঁরা যখন স্বৈরাচার করেন, তখন তা হচ্ছে গণতন্ত্র, আর অন্যেরা যখন গণতন্ত্র করেন (অবশ্য করেন না) তখন তা হচ্ছে স্বৈরাচার। ... এ বংশের অন্যতম প্রধান সম্পদ দেশবরেণ্য বুদ্ধিজীবীরা, মঞ্চ আর টেলিভিশন যাঁদের খুব ভালো লাগে।" (হুমায়ুন, ১৯৯৮ : ১৮-১৯)। এছাড়াও রয়েছে 'খোশ গণতান্ত্রিক রাজবংশ', 'রাজাকারতান্ত্রিক রাজবংশ' ইত্যাদি। কিন্তু নাম যা-ই হোক না কেন, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে তাদের তেমন কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। নির্বাচনের সময়ে কথিত রাজবংশগলো ন্যায়নীতি-আদর্শ-সততা-কল্যাণ ইত্যাদি ভালো কথায় মেতে ওঠে, তাদের সুখ থেকে "শ্রাবণের ধারার মতো ন্যায়নীতি সততা ঝরতে থাকে, জনগণ জনগণ ধ্বনিতে তারা দেশ মুখর করে তোলেন। কিন্তু পরে তার আর বালাই থাকে না।" (হুমায়ুন, ১৯৯৮ : ২০)। শক্তির উৎসবাদী গণতান্ত্রিক রাজবংশের বৈঠকে নেতা কেরামতউদ্দিনের মন্তব্যে উঠে আসে রাজনৈতিক দলের চর্চিত গণতন্ত্রের আসল চেহারা, সে বলে :

> ড্যামক্র্যাসি মিন্‌স্ মাসল প্লাস মানি, এটা ভুললে আমাদের চলবে না, ড্যামক্র্যাসিতে শুধু মানি ইস নট ইনাফ।
>
> — আমাগো ক্যাডারগো রেডি রাখতে হইবো। বলেন লিয়াকত আলি মিয়া, সারা দেশে চড়াই দিতে হইবো।
>
> — আমাদের ক্যান্ডিডেটদের মধ্যে মাননীয় জেনারেলরা থাকবেন, বিগ্রেডিয়ার, কর্ণেল, মেজর থাকবেন, তাঁরাই আমাদের বংশের মূলশক্তি, বলেন অধ্যক্ষ রুস্তম আলি পল্টু, 'আর থাকবেন কয়েকজন মাননীয় বুরোক্র্যাট ব্যারিস্টার; থাকবেন আমাদের সেই শ্রদ্ধেয় ভাইরা যারা একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ করেন নাই।... আর মাননীয় মহাদেশনেত্রীর রিলেটিভরা তো আছেনই। খালি আমাদের পার্টি থেকে ক্যান্ডিডেট দিলে হইবে না। অন্য পার্টি থেকেও ভাগাইতে হবে। (হুমায়ুন, ১৯৯৮ : ২৪-২৫)

এভাবে স্বজনপ্রীতি, দলাদলি, ক্যাডার বা পালিত সন্ত্রাস (যাদেরকে অসহায় জনগণ থেকেই ক্ষমতাসীনেরা তৈরি করে নেয়) দিয়ে 'পথের কাঁটা' সরিয়ে অর্থাৎ প্রয়োজনে হত্যা করে ক্ষমতা দখলের লিপ্সা বজায় রাখে রাজনৈতিক দলগুলো। ক্যাডার তৈরি করা হয়

শিক্ষাঙ্গন থেকেও। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো দখল করা এর একটা অংশ। আবার প্রশাসনের কর্মরত ডিসি-এসপি-ওসি-টিএনওদের জিম্মায় রাখা পলিটিক্সের অঙ্গ। পুত্রের সাথে সমকালীন রাজনীতিবিদের একটি কথোপকথন থেকেও রাজনৈতিক মূল্যবোধের তথা রাজনীতিকের মৌল চরিত্র-বৈশিষ্ট্য বিবৃত করেছেন ঔপন্যাসিক। উক্ত রাজনীতিবিদের বড় ছেলে বিদেশে থাকে এবং তাকে তিনি প্রায়ই ফোন করেন। ছেলের সঙ্গে বাবার আলাপচারিতা নিম্নরূপ :

> ওই ছেলে বলতো, 'আব্বা, কাজে অকাজে ফোন ক'রে তুমি পয়সা নষ্ট করো না, এদেশে কেউ এভাবে পয়সা নষ্ট করে না'
> এমপি সাহেব বলতেন, 'বাবা, পয়সা আমি নষ্ট করি না, এইটা আমার ফ্রি ফোন, এমপি হিসাবে পাইছি, কোনো দিন বিল দিতে হইবো না। দ্যাশবিদ্যাশে বিজনেস আমি এই ফোনেই করি'
> ছেলেটি বলতো, 'এভাবে তো তুমি ট্যাক্স পেইআরস মানির অপচয় করছো, এখানকার ওরা তা করে না'
> এমপি সাহেব হা হা ক'রে উঠতেন, হা হা হা হা, বাবা, অইটা হইলো আমেরিকা আর এইটা হইলো বাংলাদ্যাশ, এইখানে কেউ ট্যাক্স দ্যায় না। (হুমায়ুন, ১৯৯৮ : ৯)

জনগণের টাকাতেই মন্ত্রী-এমপিরা বিলাসী জীবনযাপন করে, ছেলেকে পড়তে বিদেশে পাঠায়। আবার বিদেশ পড়ুয়া ছেলের সাথে তার রাজনৈতিক মূল্যবোধের দ্বন্দ্বও সৃষ্টি হয়, কিন্তু তার সমাধান হয় না। ঔপন্যাসিক নানা দলের প্রতীকী নামকরণ করে রাজনৈতিক নেতা ও জনগনের সম্পর্কের প্রকৃত অবস্থা এবং সর্বোপরি তৃতীয় বিশ্বের একটি দরিদ্র দেশের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে এর নানা প্রতিবন্ধকতাসহ উপস্থাপন করেছেন। উপন্যাসটি সমকালীন রাজনৈতিক পরিবেশের একটি সফল ভাষ্য হয়ে উঠেছে।

হলুদ হিমু কালো র‍্যাব (২০০৬) হুমায়ূন আহমেদের (১৯৪৮-২০১২) হিমু সিরিজের একটা উপন্যাস। হিমু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণিচরিত্রের প্রতিনিধি, যে বেকার জীবনযাপন করে। এই বেকারত্ব তার স্বেছাপ্রণোদিত জীবনব্যবস্থা নয়। এটা সমকালীন বাস্তবতারই অংশ। কারণ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত তার উপযুক্ত কর্মক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ কর্মসুযোগের কারণে প্রবেশ করতে না পেরে যাযাবর উন্মুলিত চরিত্রে পরিণত হয় প্রায়ই। তাদের জীবনের সেই অর্থে কোনো বড় উদ্দেশ্য থাকে না। থাকলেও তা বাস্তবায়নের উপযোগিতার অভাবে তাদের জীবন ছন্নছাড়া পরিণতি পায়। হিমুও এর ব্যতিক্রম নয়। এরকম একটা চরিত্রের সাথে ঘটনাক্রমে র‍্যাবের জড়িয়ে পড়া নিয়ে উপন্যাসের গল্প তৈরি হয়েছে। গল্পের শুরু ফুটপাতে, কপর্দকহীন হিমু কফি খেয়ে টাকা দিতে পারে না। কফি-বিক্রেতা দশ বছরের, তাকে সে ভয় দেখিয়ে তখনকার মত টাকা দেওয়া থেকে নিজেকে বাঁচায়। কফি-বিক্রেতা বজলু কফির ফ্লাস্ক ফেলেই দৌড়ে পালিয়ে গেলে হিমু কফি-বিক্রি করতে থাকে ফেরি করে, পরে অবশ্য টাকা ও ফ্লাস্কসহ বজলুকে খুঁজে সে সেগুলো ফেরত দেয়। কফি বিক্রি শেষে রাত বারোটার দিকে মেসে ফেরার পথে হিমু র‍্যাবের দৃষ্টিতে পড়ে এবং বন্দি হয়। তার হাতে 'চেঙ্গিস খান' বই দেখে র‍্যাব তাকে সন্দেহ করে এবং লকারে ভরে রাখে। জেলখানাতে সন্ত্রাসী মুরগি ছাদেকের সাথে হিমুর দেখা হয়। জানালাবিহীন সেই ঘরের কোনায় কার্টুনের স্তুপে হেলান দিয়ে হাঁটু মুড়ে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় মুরগি ছাদেককে দেখা

যায়। সন্ত্রাসী হিসেবে শীর্ষ দশে তার অবস্থান, ধরিয়ে দিলে যার নামে পুরস্কার ঘোষণাও আছে। এই শীর্ষ সন্ত্রাসী মুরগি ছাদেক র‍্যাব সদস্যদের হাতে পরদিন নিহত হয়। পত্রিকায় খরবটি হিমু দেখে এভাবে :

শীর্ষসন্ত্রাসী মুরগি ছাদেক ক্রসফায়ারে নিহত

গোপন খবরের ভিত্তিতে কাওরানবাজার এলাকা থেকে র‍্যাব সদস্যরা মুরগি ছাদেককে গত পরশু ভোর পাঁচটায় গ্রেফতার করে। তার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হবার পর ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়। তার দেয়া তথ্যমতে গোপন অস্ত্রভাণ্ডারের খোঁজে র‍্যাব সদস্যরা তাকে নিয়ে গাজীপুরের দিকে রওনা হয়। পথে মুরগি ছাদেকের সহযোগীরা তাকে মুক্ত করতে র‍্যাবের প্রতি গুলিবর্ষণ শুরু করে। র‍্যাব সদস্যরা পাল্টা গুলিবর্ষণ শুরু করে। এই সুযোগে গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে পালিয়ে যাওয়ার সময় ক্রসফায়ারে মুরগি ছাদেক নিহত হয়। তার মৃতদেহের সঙ্গে পাঁচ রাউন্ড গুলিসহ একটি পিস্তল পাওয়া যায়। (হুমায়ূন, ২০০৬ : ৩০)

পত্রিকায় আরো একটি খবর হিমুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তা হল :

দেশরত্ন শেখ হাসিনার পুত্র জয়ের আগমন।

ইন্টারেস্টিং খবর তো বটেই। দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার পুত্র তারেক রহমান রাজনীতি করবেন, আর শেখ হাসিনা চুপ করে বসে থাকবেন, তা হবে না। এবার হবে পুত্রে পুত্রে লড়াই। আমরা নিরীহ দেশবাসী মজা করে দেখব। (হুমায়ূন, ২০০৬ : ৩১)

দুটি খবরই রাজনীতি এবং প্রশাসন-সংশ্লিষ্ট এবং হিমুর দৃষ্টিতে অবান্তর ও অর্থহীন, ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় সে এগুলোকে বলেছে 'ইন্টারেস্টিং'। মুরগি ছাদেককে ক্রসফায়ারে হত্যার খবরে কোনো যৌক্তিকতা নেই। হিমুর অনুভূতি :

আমি খবরটা মন দিয়ে পড়লাম। সবই ঠিক আছে, একটা শুধু সমস্যা। মুরগি ছাদেক পাঁচ রাউন্ড গুলি এবং পিস্তল নিয়ে র‍্যাবের সঙ্গে গাড়িতে বসেছিল। এত জিজ্ঞাসাবাদের পরেও কেউ বুঝতে পারে নি মুরগি ছাদেকের সঙ্গে গুলিভরা পিস্তল আছে? (হুমায়ূন, ২০০৬ : ৩০)

'ডাণ্ডা মেরে র‍্যাব সব এভাবে ঠাণ্ডা' করে দিতে চায়। কারণ, 'এই দেশে ডাণ্ডা ছাড়া কিছু হবে না'। হিমুর সাথে র‍্যাবের এই কর্মকাণ্ড-সম্পর্কিত একটি কথোপকথন আছে উপন্যাসের শেষে। সে তাদের এসব অস্বাভাবিক আইনী ব্যবস্থার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুললে একজন র‍্যাব সদস্য বলে :

...আপনি কেন আমাদের কর্মকাণ্ড সমর্থন করেন না বলুন তো? আপনার যুক্তিটা শুনি। আপনি কি চান না ভয়ঙ্কর অপরাধীরা শেষ হয়ে যাক? ক্যান্সার সেলকে ধ্বংস করতেই হয়। ধ্বংস না করলে এই সেল সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে।

উত্তরে হিমু বলে :

... স্যার, মানুষ ক্যান্সার সেল না। প্রকৃতি মানুষকে অনেক যত্নে তৈরি করে। ... এত যত্নে তৈরি একটা জিনিস বিনা বিচারে ক্রসফায়ারে মরে যাবে — এটা কি ঠিক?

— পিশাচের আবার বিচার কী?

— পিশাচেরও বিচার আছে। পিশাচের কথাও আমরা শুনব। সে কেন পিশাচ হয়েছে এটাও দেখব। (হুমায়ূন, ২০০৬ : ৯১-৯২)

অপরাধ সৃষ্টির উৎস যে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং অস্থিতিশীল রাজনীতি এর দায় রাষ্ট্রেরই। অথচ রাষ্ট্র প্রশাসনিক বাহিনী দিয়ে সে দায় থেকে মুক্ত হতে চায় অপরাধীকে হত্যা করে। ঘুষ ও দুর্নীতি কীভাবে সকল ক্ষেত্রকে স্পর্শ ক'রে জনগণকেই কেবল বঞ্চিত করছে নানা দিক থেকে তার টুকরো চিত্র আছে। সরকারি হাসপাতাল ঢাকা মেডিকেল কলেজে অসুস্থ রোগীর কেবিন পাওয়া নিয়েও রয়েছে ঘুষ। ছোট ছোট ছিনতাইকারী দলবদ্ধ চক্রে নানা কৌশলে সাধারণ নাগরিককে সর্বস্বান্ত করছে। কফি-বিক্রেতা বস্তিবাসী বজলুর মা বজলুকে লেখাপড়া করিয়ে বড় করার স্বপ্ন দেখায়। আন্তর্জাতিক হিরোইন চক্রের সদস্য চীনা মেয়ে হু সি হংকং পারলারে কাজ করার ছদ্মবেশে হিরোইন সরবরাহ করে, পরে যদিও র‍্যাব তাকে ধরে এবং বিচারে তার যাবজ্জীবন হয়। উপন্যাসের এই সব বর্ণনা থেকে বাংলাদেশের নানা সীমাবদ্ধ চিত্র উঠে এসেছে।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের (জ, ১৯৫১) *আজগুবি রাত* (২০০১) উপন্যাসটি গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে লেখা এক প্রান্তিক নারী চরিত্রের জীবন নিয়ে রচিত হয়েছে। নূর বানু নামের এক গ্রাম্যবধূর মৃত্যু এবং একজন খুনী কর্তৃক তার কাটা হাত নিয়ে উপন্যাসের গল্প এগিয়েছে। এরই সাথে যুক্ত হয়েছে প্রশাসন এবং কিছু অংশে রাজনৈতিক ক্ষমতার চিত্র। কাহিনীটি শুরু হয় নূর বানুর কাটা হাতের রহস্যের মধ্য দিয়ে। তার কনুই থেকে বিচ্ছিন্ন করা কাটা হাতটি বলেশ্বর নদী দিয়ে ভাসতে ভাসতে পাথরঘাটার খেয়াঘাটে এসে ঠেকে। তা নিয়ে উৎসুক জনতার ভিড় হয় এবং ভিড়ের মধ্য থেকে তশারফ আলী ও সজ্জন নামক দুই ব্যক্তি হাতটি নিয়ে থানায় যায়। থানার ওসি থেকে শুরু করে জনপ্রশাসনে দায়িত্ব পালনকারী ইউএনও, সচিব এবং মন্ত্রীর চরিত্র ও দায়িত্ববোধ এবং তাদের মধ্যকার পেশাগত সম্পর্কের একটা অবস্থা দৃশ্যমান হয়। পাথরঘাটায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে ১০ নম্বর সতকর্তা সংকেত ঘোষিত হয়। দুর্যোগ মন্ত্রী ও সচিবের প্রসঙ্গ একারণেই এসেছে। দুর্যোগ প্রতিমন্ত্রী ঢাকা থেকে টেলিফোনে ওসিকে দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য নির্দেশ দিলে তিনি জনবলের অভাবের কথা জানান। অথচ পরে সমালোচিত হলে এজন্য মন্ত্রী সচিবকে অভিযুক্ত করেন; সচিব এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সে ক্ষোভ তার নিচের পদমর্যাদার ওসি এবং ইউএনও এর উপর প্রকাশ করেন। মন্ত্রীর মেজাজে তিনি ভীত ছিলেন এই ভেবে, এবার 'ওএসডির খড়্গ ঠিকই পড়বে ঘাড়ে'। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে সবকিছু নিয়ন্ত্রণের ভার থাকলেও তারা সবসময় তা করতে সফল হয় না। পাথরঘাটায় দুর্যোগ, নূর বানুর কাটা হাতকে ঘিরে নানা পক্ষের লোকজনের আগ্রহ, বিশেষত ঢাকা থেকে চলচ্চিত্রের শ্যুটিং করতে আসা নায়ক এবং তাদেরকে নিরাপদে কাজ করতে দেওয়ার জন্য পুলিশের ভূমিকা, এবং উপকূলীয় বনায়নের উপর প্রতিবেদন তৈরি করতে আসা 'সোনার বাংলা' টিভি-সাংবাদিক ও ক্যামেরাম্যান — এদের সবাইকে ঘিরে পুলিশ প্রশাসনের একটি চিত্র ফুটে উঠেছে। ওসি সাহেবের মেজাজ চড়ে যায় এই ভেবে যে একসঙ্গে এতকাজ তিনি করেন এক ডজন মাত্র মানুষ নিয়ে। ওদিকে কাটা হাত নিয়ে আসা তশারফ আলীর পুলিশ সম্পর্কে ধারণা — অন্য কোন দিন হলে থানায় খুব ভোগান্তি হতো তার, পুলিশ প্রথমেই সন্দেহ করত তাকে, হয়তো গারদেই ঢোকাত, অথবা এক দুই হাজার টাকা খসিয়ে নিত তার পকেট থেকে।

মুহম্মদ জাফর ইকবালের (জ. ১৯৫২) *মহব্বত আলীর একদিন* (২০০৬) উপন্যাসে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও জাতীয় রাজনীতি কী করে বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রভাবিত করে

তার সংক্ষিপ্ত চিত্র। দুর্নীতিগ্রস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা চিত্র উপাচার্য মহব্বত আলীর জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে, ছাত্র রাজনীতি কী করে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে তাও স্পষ্ট এ উপন্যাসে। ছাত্ররা সন্ত্রাসী ক্যাডারে পরিণত হয় শিক্ষক-রাজনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ দলীয় রাজনীতি তথা দুর্নীতি দ্বারা আক্রান্ত, উপন্যাসে রয়েছে তার বর্ণনা, নিয়োগপ্রাপ্ত মহব্বত আলীর দৃষ্টিকোণে সত্যটি ধরা পড়েছে এভাবে :

> তারা যখন ছাত্র ছিলেন তখন ভাইস চ্যান্সলররা ছিলেন জ্ঞানী-গুণী মানুষ। এখন সেটা পাল্টেছে, শুধু তোষামোদি করে, দলবাজি করে আর ঠিক ঠিক জায়গায় টাকা খরচ করে ভাইস চ্যান্সেলর হওয়া যায়। (জাফর, ২০০৬ : ১৭)

এটা দুর্নীতিগ্রস্ত কেন্দ্রীয় প্রশাসনেরই একটি অংশের রূপ, যা সামগ্রিক প্রশাসনকে ও এর অধঃপতনকে নির্দেশ করে। এছাড়া উপাচার্যের পদাধিকারকে বিকৃত করে ক্ষমতার যথেচ্ছাচার করা হয়েছে, মহব্বত আলীর তেমনই কয়েকটি কর্ম-বিবরণ হল :

- তিনি বিশ্ববিদ্যালয় সিলেকশন কমিটিতে দলীয় রাজনীতির কারণে অসৎ ও অযোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করেন, যেমন — নিজের গা বাঁচাবার জন্য সবচেয়ে বড় পত্রিকার ব্যুরো চিফের ভাতিজাকে জিওলজি ডিপার্টমেন্টের লেকচারার হিসেবে নিয়ে রেখেছেন, কাজেই সেই পত্রিকাটা তার বিষয়ে বিরোধী কিছু ছাপবে না।
- ফাইন্যান্সের ডেপুটি ডিরেক্টরকে বেশ কয়েকজনকে ডিঙিয়ে প্রমোশন দিয়েছেন, তাই সে ভিসির একান্তই বাধ্য।
- ইউনির্ভাসিটির এফিলিয়েটেড মেডিকেল কলেজে পরিদর্শক টিম যায় এবং মহব্বত আলী নিয়ম করে ফেলেছেন — যতবার তিনি যাবেন তাকে দশ হাজার টাকা দিতে হবে।
- সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের নির্বাচনে দলীয় শিক্ষকেরা তাদের দলের শিক্ষক কতজন আছে হিসেব করেন।
- হল শাখার সেক্রেটারি জুয়েল একজন ছাত্রীকে ধর্ষণ করে, কিন্তু ধর্ষক ছেলেটি সম্পর্কে এমপি সাহেবের ভাতিজা এবং লোকাল বা স্থানীয় ছেলে হওয়ায় সাধারণ ছাত্রদের প্রতিবাদকে ক্যাডার ছাত্র দিয়ে গুঁড়িয়ে দেবার সিদ্ধান্ত তারই।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির যে রূপ এখানে প্রকাশিত হয়েছে, তা সমকালীন বাস্তবতা থেকে খুব দূরে নয়। রাজনৈতিক সময় পরম্পরায় দেশের ক্ষমতাসীন ও বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব-সংঘাতপূর্ণ আচরণ উচ্চশিক্ষার এসব প্রতিষ্ঠানকে কীভাবে প্রভাবিত করে, তার একটা সচল চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে এ উপন্যাসে।

জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা (১৯৮৮) শহীদুল জহিরের (১৯৫৩-২০০৮) প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। উপন্যাসটির বিষয়বস্তু সাধারণভাবে মুক্তিযুদ্ধ মনে হলেও পরিসরের ব্যাপ্তিতে তা এগিয়ে গেছে আরও অনেকটা সময়। ১৯৭০ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত সময় ধরে উপন্যাসের পট নির্বাচিত হওয়ায় রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের যোগসূত্র সমকালের সাথেও গ্রথিত হয়ে আছে। উপন্যাসটির রচনাকালও (১৯৮৬) এ দিক থেকে তাৎপর্যের দাবিদার। সামরিক শাসনব্যবস্থায় তখন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। রাষ্ট্রিক

পরিমণ্ডলে রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে বিবেচনায় এনে বলা যায়, ১৯৮৬ সালের নির্বাচন অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। শহীদুল জহির এই চলমান রাজনৈতিক বাস্তবতার ব্যাপারে সম্যক বিচলিত ছিলেন। এই বাস্তবতা তাঁর উপন্যাসের চরিত্রের বিকাশ ও বিপন্নতার সাথে সম্পর্কিত। (মানস, ২০০৮ : ১৬)। উপন্যাসের শুরুর সময় ১৯৮৫। যুবক আবদুল মজিদের পরিণত বয়স থেকে ফ্ল্যাশব্যাকে মুক্তিযুদ্ধের পরিবেশ অঙ্কিত। মুক্তিযুদ্ধের প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক গোষ্ঠীর হিংস্রতা ও কৌশলের একটা চিত্রমালা উপস্থাপন করেছেন ঔপন্যাসিক। হিংস্রতার এই চিত্রমালা কাঠামোগতভাবে উপন্যাসের এবং এর প্রধান চরিত্র মজিদের পরিণতির সঙ্গে সম্পর্কিত। উপন্যাসে অনেক মৃত্যুর মাঝে অন্তত দুটি মৃত্যুর কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। একটি আলাউদ্দিন ও অপরটি মজিদের বোন মোমেনার। দুটোরই হত্যাকারী বদু মওলানা। এছাড়া দুটো হত্যার কারণ বা অজুহাত হত্যাকারী দিয়ে রেখেছে হত্যার যথাসম্ভব আগে। দুটো অজুহাতই ধর্মের ব্যাখ্যাজনিত — 'আলাউদ্দিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেচ্ছাপ করেছে' আর মোমেনা খ্রিষ্টান মেয়ের সঙ্গে গান-বাজনা করতে গির্জায় যেত। এ দুজন ছাড়াও উপন্যাসে রাজাকার আবদুল গণির দেয়া তালিকা অনুযায়ী খ্রিষ্টানদের কবরস্থান খুঁড়ে পাওয়া ছাপান্নটি মাথার খুলি বা হত্যার দায় বদু মওলানার। কিন্তু একাত্তরের এই রাজাকারদের কর্মকাণ্ড বর্ণনা করে মুক্তিযুদ্ধকে অনুধাবন করানোই ঔপন্যাসিকের একমাত্র অভিপ্রায় নয়। বদু মওলানার রাজনৈতিক স্বপক্ষীয়দের পুনর্বাসন প্রক্রিয়াকে শহীদুল জহির চিহ্নিত করেছেন তাঁর সমকালে। যে রাজনৈতিক বাস্তবতা নিয়ে ঔপন্যাসিক চিন্তিত, গুরুত্বপূর্ণ মূলত তা-ই। রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নে মৌলবাদী বা স্বাধীনতাবিরোধী সেই শক্তির পুনরায় বিকাশ এবং ক্রমশ রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার হওয়াই সচেতন লেখককে সবচেয়ে বেশি তাড়িত করে। উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধ ও বিজয়ের দু'বছর পর বদু মওলানাকে পুরনো ঢাকার লক্ষ্মীবাজারের মহল্লায় ফিরতে দেখা যায়। কেবল তা-ই নয়, আজিজ পাঠানের বাড়িতে আশ্রয় পাওয়া বদু মওলানা মহল্লার লোকের প্রবল ঘৃণা সত্ত্বেও তাদেরকে 'ক্রমাগতভাবে অতীত ভুলে যাবার' তাগাদা দেয়। তার এসব অবিচলিত কর্মকাণ্ডে বিহ্বল আবদুল মজিদ বাস্তুচ্যুতির সিদ্ধান্ত নেয়, এছাড়া সে দেখে একাত্তরের স্মৃতি সবচেয়ে বেশি মনে আছে বদু মওলানার। সে এই বিষয়টিও ভোলে নি যে, মোমেনাকে রাজাকাররা ধরে নিয়ে হত্যা করেছিল এবং "সম্ভবত দেশ মুক্ত হওয়ার পর মহল্লায় ফিরে আলাউদ্দিনের মায়ের তাড়া খাওয়ার পর বুঝতে পারে যে, এই জনগোষ্ঠীও কোনো কিছু ভুলে যায় নাই। কারণ যে বদু মওলানা, আবদুল মজিদের সঙ্গে অপ্রয়োজনে কথা বলে না, সে একদিন তাকে রাস্তায় থামিয়ে তার বাচ্চা মেয়ের কুশল জিজ্ঞেস করে এবং তারপর বলে, 'বইনের নামে নাম রাকছো, বইনেরে ভুলো নাইকা?' আবদুল মজিদ যে মোমেনার কথা কোনোদিন ভুলবে না সেটা তো বদু মওলানার জানাই আছে।" (শহীদুল, ২০০৭ : ৫১)। সুতরাং জিঘাংসার নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতা সামনে তৈরি হবে, একথা নিশ্চিত জেনে মজিদ ঘরবাড়ি বিক্রি করে মহল্লা ছাড়তে চায়। যদিও সে বুঝতে পারে সাহসী হওয়াটা প্রয়োজন; কিন্তু তা হওয়ার নিয়ম সে খুঁজে পায় না। তাই "সে প্রথমে নিজেকে বাঁচাতে চায় এবং কোনো সমষ্টিগত প্রচেষ্টার অবর্তমানে সে তা করতে পারে এখনই মহল্লা ত্যাগ করে।" (শহীদুল, ২০০৭ : ৫২)। যথারীতি ১৯৮৬ সনে ইত্তেফাক পত্রিকায় তার বাড়ি বিক্রির বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় এবং "ধরে নেয়া যায় যে, তাদের বাড়ি

বিক্রি হয়ে গিয়ে থাকলে লক্ষ্মীবাজারে তাদের নাম অবলুপ্ত হয়েছে।" আবদুল মজিদের এই সংকটের বিষয়টি মহল্লার লোকেরা বুঝতে না পারলেও ঔপন্যাসিক রাজনৈতিক বাস্তবতার বয়ানটি পাঠকের কাছে ঠিকই পৌঁছে দেন। তৎকালীন বাস্তবতার এই রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের সাথে সমকালীন বাস্তবতার যোগসূত্রটি মৌলবাদী শক্তির পুনরুত্থান ও ক্ষমতায়নের সাথে জড়িত। স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি যে পুনরায় তাদের শক্তি সংগঠিত করে ফিরে এসে সুযোগ পেলেই নতুন আঘাত করবে — এ উপলব্ধি থেকেই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পর নির্লিপ্ত দেশোদ্ধারের রিক্ত সংবাদ উপন্যাসে নিরাবেগ বাক্যে ঘোষিত হয়েছে।

মঞ্জু সরকারের (জ. ১৯৫৩) *তমস* উপন্যাসের রচনাকাল ১৯৮৪। সমকালীন রাজনৈতিক সত্যের একটি অংশের বিচারে এই উপন্যাসটিও গুরুত্ববহ। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মঈন, যে তার স্ত্রী-সন্তানসহ ঢাকা থেকে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গেলে চোরের কবলে পড়ে সর্বস্ব হারায়। চুরির এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের কাহিনী এগিয়ে যায়, তবে মুখ্যভাবে বিশ্লিষ্ট হয়েছে রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় রাজনীতির সাথে সূত্রবদ্ধ গ্রামীণ রাজনীতি। সেই সাথে মঈনের পূর্ববর্তী বিপ্লবী জীবন ও বর্তমান আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় হারানো বিপ্লবী চেতনার অন্তর্ঘাতে জর্জরিত মনে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব উপন্যাসে শিল্পিতভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বঙ্গেশ্বরী গ্রামের ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান ও এলাকার ক্ষয়িষ্ণু জোতদার মোজা তালুকদারের ছেলে হিসেবে ঢাকাবাসী মঈনের গুরুত্ব গ্রামে যথেষ্টই। সে বর্তমানে একটা এনজিও-তে উচ্চপদস্থ অফিসার। একসময় '৬৯-এর আন্দোলনে আকৃষ্ট হওয়া ও বাম ছাত্রসংগঠনের আবেগপ্রবণ কর্মী মঈন লেনিন-মাও সেতুং-এর চিন্তাধারা কিংবা সাম্রাজ্যবাদ-শোধনবাদ-আধা সামন্তবাদ-বুর্জোয়া-শ্রেণিশত্রু ইত্যাদি আওয়াজে অভ্যস্ত ছিল। এরপর স্বাধীনতা যুদ্ধ ও যুদ্ধ-পরবর্তী রাজনীতিতে কমিউনিস্ট দলের সংহতি আর যোগাযোগ ভেঙে পড়ে। যদিও মঈন তখন সর্বহারাদের মুক্তির সংগ্রামে নতুন উদ্দীপনায় যোগ দেয়। কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় সংক্রমিত সমাজরাষ্ট্রে সে বিপ্লব বেশিদিন টেকে না। আধা সামন্ততান্ত্রিক কিংবা নয়া ঔপনিবেশিক দেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মধ্যবিত্ত প্রায়ই পরিণত হয় সুবিধাভোগী, স্বার্থপর ও দালাল চরিত্রে। তাই অতীতের বিপ্লবী জীবন তাকে পুনরায় আকৃষ্ট করলেও বিভ্রান্ত মঈন তার রাজনৈতিক চরিত্র খুঁজে পায় না, ভেবে পায় না কোন্ পার্টির সাথে আবার একাত্মতা ঘোষণা করবে। বঙ্গেশ্বরীর দরিদ্র, না খেতে পাওয়া কঠিন জীবন-সংগ্রামী মানুষগুলোর সবাইকে তার চুরি হওয়া জিনিসপত্রের চোর মনে হয় তার। সিদ্ধান্ত নেয় সে, নতুন করে গ্রামেই রাজনীতি শুরু করবে। গ্রামের মানুষকে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষা দেবে। কিন্তু তা ভেবেও নিজের শ্রেণিগত অবস্থান ও সে অবস্থানের ভূমিকা নিয়ে প্রবল দ্বান্দ্বিকতা থেকে মুক্তি পায় না সে; বরং ঘুমের ঘোরে অতীতে নিহত সংগ্রামী বিপ্লবী আত্মারা বীভৎস মূর্তিতে ফিরে এসে তার বিবেকের সাথে তর্কের ঝড় তোলে। ভীত, দ্বিধাদীর্ণ মঈন প্রশ্ন করে নিজেকেই :

> বঙ্গেশ্বরীতে বেশির ভাগ মানুষ যখন অনাহারে, তখন হোটেল-পার্টি-মদ-মাংস, ক্ষমতার স্বাদ-গন্ধ মঈন কি একা সব খায়? বঙ্গেশ্বরীতে বেশির ভাগ মানুষ যখন বিবস্ত্র-প্রায়, তখন বিদেশী

> কাপড় মঈন কি একা পড়ে? বঙ্গেশ্বরীর প্রাচীন আঁধারে যখন অসহায় অসুস্থ মানুষের অসুখী আর্তনাদ তখন নগরে রঙিন আলোকসজ্জা কি মঈন একাই দেখে? আদর্শ ভুলে জীবনের মোহের কাছে পরাস্ত সৈনিক পৃথিবীতে কি মঈন প্রথম? মুখে মুখে বিপ্লবের সপক্ষে জয়ঢাক পিটিয়ে স্বঘোষিত প্রগতিশীল, মনে-মনে ঢাকায় বাড়ি করার কি বিদেশে পাড়ি দেবার স্বপ্ন লালন, কাজেকর্মে বিপ্লব ঠেকানোর কাজে সাম্রাজ্যবাদী সাহায্যের মোটা অংশ পাওয়ার ধান্ধাবাজি — এই অসঙ্গতি কি একা মঈনের অপরাধ? তবে কেন অকালে একা একা, অপঘাতে মরবে সে? (মঞ্জু, ২০০১ : ৬৪)

আবার "স্বাধীনতর পর যেসব বামপন্থী দল ক্ষমতাসীন সরকারের বিরোধিতা করেছিল, মঈনের দলও ছিল তাদের মধ্যে প্রধান। শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর তার দলকে ঠেকাতে পরবর্তী সরকার এই সব বাম বিপ্লবী দলকে কাজে লাগাতে চায়। কমিউনিস্ট নামধারী দলগুলোর মধ্যে তখন অনেক ভাঙাগড়া চলছে। সশস্ত্র বিপ্লবের পথ ছেড়ে কেউ পার্লামেন্টারি বিপ্লবের পথে আসছে। আবার আন্ডারগ্রাউন্ডে যেতে চাইছে কেউবা। নেতাদের মধ্যে নানা বিতর্ক। কর্মীদের মধ্যে হতাশা। বিপ্লবের নামে এতোদিন যা হলো, সবই ছিল ভুল? ভাঙতে ভাঙতে মঈনের দলের একটি অংশ সরকারের সাথে একাত্ম হয়ে যায়।" (মঞ্জু, ২০০১ : ৪৫)। তাছাড়া মঈন জানে, এক সময়ের বিপ্লবী কমিউনিস্ট দল এখন ভেঙে টুকরো-টুকরো, কর্মীরা সব হতাশ, নেতারা গোপনে বিদেশী দূতাবাসে লাইন দেয়, বঙ্গভবনে ডিনার খায়, বিদেশী সাহায্য সংস্থা কিংবা বুর্জোয়াদের গোপন দান-খয়রাত নিয়ে বেঁচে আছে সবাই। মঈনের পক্ষে তাই অতীতচারী হয়েও বর্তমানের স্থিতিশীল জীবন ছেড়ে পূর্বের জীবনে আর ফেরা হয় না। গ্রামে অবস্থানকালে তার চুরি হওয়া জিনিসপত্রের দায় ষড়যন্ত্রমূলকভাবে তাদের বাড়ির একসময়ে পুরনো চাকর ফজুর ঘাড়ে চাপায় গ্রামের ডাকাত দলের প্রধান কোব্বাত, যাকে আবার খালেক চেয়ারম্যান পরোক্ষ আশ্রয় দেয় রাজনৈতিক শক্তি পাকাপোক্ত করার জন্য। নির্দোষ ফয়জুদ্দির বাড়ি থেকে চুরি যাওয়া জিনিসপত্র উদ্ধার হলে মোজা তালুকদারের বাড়িতে ডেকে এনে কপট জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে কোব্বাত তাকে ছুরিকাঘাতে মেরে ফেলে। ফয়জুদ্দির নিরীহ অনাহারী পরিবারের হয়ে গ্রামবাসী এ হঠকারী খুনের বিচার চাইলেও রাতের আঁধারেই খালেক চেয়ারম্যান, মোজা তালুকদার বিহ্বল মঈন ও তার পরিবারকে ঢাকায় পাঠিয়ে দেয়। গ্রামবাসীকে বলে, ঢাকা থেকে খুনের বিচারের ব্যবস্থার জন্য মঈন রাতারাতি গ্রাম ছাড়ছে। এভাবে হতদরিদ্র ফয়জুদ্দি কিংবা গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে রাজনীতিক খালেক চেয়ারম্যান আর বিত্তবান প্রভাবশালী জোতদার ও তার মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পুত্র একজোট হয়ে জিতে যায়। ফয়জুদ্দির ধড়বিহীন লাশ যদিও মঈনের বিবেকী অন্তর্জ্বালার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু শোষিত, দরিদ্র অনাহারী মানুষকে পেছনে ফেলে নগরমুখী স্বার্থবিদ্ধ ও নিশ্চিন্ত জীবনে মঈনের ফেরার মধ্য দিয়েই উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটে। আদর্শবাদী মধ্যবিত্তের এই পরাজয় জটিল আর্থনীতিক রাজনৈতিক সত্যের মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। সমকালীন আর্থ-রাজনীতিক কাঠামোর ভেতরেও এই বাস্তবতা নিহিত হয়ে আছে।

এই দেখা যায় বাংলাদেশ (২০০৬) মঈনুল আহসান সাবেরের (জ. ১৯৫৮) উপন্যাস। এখানে একজন সাধারণ চাকুরিজীবী মানুষের গল্প বলা হয়েছে। এই গল্প বা জীবনের সঙ্গেই উঠে এসেছে বাংলাদেশের ক্ষমতাহীন মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম,

সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয়, প্রতিকারহীন অন্যায়ের অব্যাহত বেড়ে চলা, স্থবির প্রশাসন, কলুষিত রাজনীতির প্রতিফলনযুক্ত সমাজ ও সর্বোপরি এক পিছিয়ে পড়া দেশের চিত্র। আবদুস সাত্তার পেশায় একজন চাকুরিজীবী, তাঁর মেয়ে নীল, সাদা ও ছেলে সবুজ। তিনি একান্তই মধ্যবিত্ত এবং আপাত অর্থে ক্ষমতাহীন। এলাকার মাস্তান ছেলেরা তার স্কুলছাত্রী মেয়ে নীলকে রাস্তায় উত্যক্ত করে। এ নিয়ে নীলের ভাই সবুজ প্রতিবাদ করে মাস্তান ছেলেটিকে চড় মারলে তারা সবুজের হাত ছুরি দিয়ে কেটে ফেলে। এর প্রতিবাদ জানাতে আবদুস সাত্তার থানায় অভিযোগ করে অপরাধীকে ধরতে অনুরোধ করেন। কিন্তু দিনের পর দিন এমনকি মাস চলে গেলেও অভিযোগের পক্ষে কোনো উদ্যোগ গৃহীত হয় না, তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা থানায় বসে থেকেও কর্তব্যরত অফিসারের দেখা পান না। দেখা পেলেও মিথ্যা বা দায়সারা আশ্বাস দিয়ে তাকে বিদায় করা হয়। অথবা তাকে বলা হয় :

> ...আপনি ভুক্তভোগী, তাই আপনার ধারণা, পুলিশ বিভাগের সবার আপনার কেসটা নিয়ে ঝাপিয়ে পড়া উচিত। কিন্তু তাই যদি হয়, অন্যান্য ভয়ঙ্কর কেসগুলোর তা হলে কী হবে? ... আপনার যে ঘটনা, সেসব ক্ষেত্রে আমার সাজেশন কী জানেন — দুই পার্টির মধ্যে মিলমিশ করে নেয়া। এত ছোট ঘটনা নিয়ে এগিয়ে লাভ হয় না। ছোট ঘটনা! (মঈনুল, ২০০৬ : ১৩)

অর্থাৎ একটা কিশোরী মেয়েকে প্রতিনিয়ত রাস্তায় উত্যক্ত করা, তার শ্লীলতাহানি করা এবং প্রতিবাদ করতে গেলে তাদের ছুরির আঘাতে ভাইয়ের হাত কেটে তাতে এগারটি সেলাই পড়া — এগুলো পুলিশ অফিসারের কাছে ছোট ঘটনা। বাংলাদেশে ঘটা এগুলো ছোট ঘটনা হিসেবে প্রশাসনের কাছে বিবেচিত হলে এটা পরিষ্কার হয় যে, নিয়ত ভয়ংকর অপরাধের মধ্যেই আমাদের বসবাস। আর প্রশাসন এসব ব্যাপারে অন্য কারণেও নির্বিকার। এসব ছোট অপরাধী ধরতে তারা মোটা অঙ্কের কোনো ঘুস পায় না, আবার অভিযোগকারীর কাছ থেকে গাড়ির তেলের টাকা ঘুস নিয়ে অপরাধীদের ধরতে যদিবা যায় সবার চোখের সামনে থেকেও অফিসারের ভাষায় তখন মাস্তানেরা 'আন্ডারগ্রাউন্ডে' চলে যায়, প্রশাসন দেখেও তাদের একেবারেই দেখে না, তারা দাপটের সাথে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালেও না। অফিসারের উক্তি :

> শোনেন ভাই, আমরা তো এখন থেকেই চেষ্টা চালাব। হ্যাঁ, এক দিনের মধ্যে কেন, দু-তিন ঘন্টার মধ্যে তারা ধরা পড়তে পারে, আবার এক বছর কিংবা এমনও হতে পারে দু-তিন বছরের মধ্যে ওদের ধরা গেল না (মঈনুল, ২০০৬ : ৩৬)

এটা আসলে নামমাত্র শাসনব্যবস্থার সীমাহীন স্থবিরতার প্রকাশ। আবদুস সাত্তার বিষয়টি নিয়ে জোর করলে তিনি ইঙ্গিত করে বলেন :

> তবে তাই বলে ভেবে নেবেন না এই এখনই ওরা ধরা পড়বে। আমাদের চেষ্টা থাকবে, কিন্তু ওদের পেতে তো হবে। তা ছাড়া প্রায়োরিটির একটা ব্যাপার আছে...।
> ... আমাদের ম্যানপাওয়ার কম। অপরাধ সে তুলনায় অনেক বেশি। বড় বড় সব অপরাধ। আমাদের তাই প্রায়োরিটির ভিত্তিতে কাজ করতে হয়। (মঈনুল, ২০০৬ : ৩৬)

সুতরাং ক্ষমতা ও টাকা এই 'প্রায়োরিটিকে' তৈরি করে। আবদুস সাত্তারের মত ক্ষমতাহীন সাধারণ মধ্যবিত্তকে তখন থানা থেকে বিরাট শূন্যতা নিয়ে বের হয়ে আসতে হয়। মেয়ে

নীলের প্রতি এই অসহনীয় অপরাধ ঠেকাতে তিনি থানা, নারী সংগঠন, অফিস কলিগ-বাড়িওয়ালা এমনকি মন্ত্রীর কাছে পর্যন্ত যান। কিন্তু কেউ কিছু করতে পারে না। মন্ত্রী বিরক্ত হয়ে বলেন :

> ... এ তো মহা মুশকিল হলো দেখছি! মন্ত্রী হয়েছি বলে কি এলাকার মানুষের ছাগল হারিয়ে গেলে সেই ছাগলও আমাকে খুঁজে দিতে হবে!
> ... এগুলো আসলে বুদ্ধি করে মিটিয়ে ফেলতে হয়। সেটা যখন পারছেন না, আমি আমার পিএস-কে বলে দিচ্ছি। সে লোকাল থানায় বলে দেবে। (মঈনুল, ২০০৬ : ৫৮-৫৯)

সব জায়গা থেকেই তাকে অপরাধীদের সাথে আপস বা সমন্বয় করে ব্যাপারটি মিটিয়ে ফেলতে বলা হয়। কারণ সাধারণ মানুষ কিছুই করতে না পেরে আপস করছে, আর ক্ষমতাসীনেরা অপরাধের ধারক-বাহক হয়ে সবাইকে নির্বিবাদে তা মেনে নিতে বাধ্য করছে। উপন্যাসে আবদুস সাত্তারকেও দেখা যায় অসহায় হয়ে যেতে, তা-ও এলাকার উঠতি কয়েকটা বখাটে মাস্তানের কাছে, যাদের জন্য নীলের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়, তারা এলাকা ছেড়ে ভিন্ন বাসায় চলে যান। নতুন এলাকায় দশ দিনের মাথায় একই উপদ্রব শুরু হয়। পূর্ব এলাকার মাস্তানেরা এবার নতুন এলাকায় মাস্তান পাঠিয়ে নীল ও তার বাবাকে হুমকি দেয়, বাসা থেকে নীল ওই মাস্তানের বিয়ে সংসার করা বউ বলে চিৎকার করে। স্ত্রীর কাছে আবদুস সাত্তার অভিযুক্ত হন অপদার্থ পিতা হিসেবে, জবাবে যদিও তিনি বলেন :

> ... আমি চেষ্টার কোথায় ত্রুটি রেখেছি, বলো? দিনের পর দিন থানায় গিয়ে বসে থেকেছি। মন্ত্রীকে দিয়ে বলিয়েছি। তাও কোনো কাজ হয়নি। থানা থেকে বার বার বলেছে, তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এমনও বলেছে, যদি সত্যিই নীল ওই ছেলেকে বিয়ে করে থাকে। এর কী জবাব দেব? আমি বাড়িওয়ালার কাছে গেছি, এলাকার অপরিচিত লোকজনের কাছে গেছি। আমি পত্রিকায় নিউজ করিয়েছি, বড় নিউজ। ... এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে আমি যাইনি। ... কাজ হয়নি অবশ্য। সেদিক দিয়ে তুমি আমাকে ব্যর্থই বলতে পার। (মঈনুল, ২০০৬ : ৫৯)

সুতরাং সাধারণ মানুষ তার সম্মান, চারিত্রিক মর্যাদা ও নিরাপত্তা সকল কিছুই এই রাষ্ট্রের কাছে হারায়। নীলের ব্যাপারটা সমাধান হবার একটা চিত্র ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন বটে। কিন্তু তা প্রশাসনের কোনো ব্যবস্থার কারণে ঘটেনি, সেটা লেখাপড়াহীন আরেক মাস্তান বা রাজনৈতিক দল পালিত তথাকথিত ক্ষমতাধর ক্যাডার এসে সমাধান করেছে। সেটাও কতটুকু স্থায়ী তা জানা যায় না আর। *এই দেখা যায় বাংলাদেশ* উপন্যাসে এক বায়োস্কাপওয়ালা প্রতীকী চিত্রে এক স্থবির, মূল্যবোধহীন, ভগ্ন বাংলাদেশকে বারবার আমাদের কাছে উপস্থাপন করেছে, যে বাংলাদেশে সাধারণ কিংবা ভয়ংকর কোনো অপরাধেরই প্রশাসনিক কোনো সমাধান নেই।

উপন্যাসে বাংলাদেশের শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী র‍্যাবের ক্রসফায়ার প্রসঙ্গটি এসেছে। জঙ্গি সন্দেহে আবদুস সাত্তারকে র‍্যাব সদস্যরা ধরে নিয়ে যায়। কিন্তু তিনি অপরাধী নন। এটা তদন্তের পর র‍্যাব তাঁকে ছেড়ে দেয়। তবে প্রসঙ্গটি গুরুত্ব পায় শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অর্থহীন অমূলক সন্দেহ ও স্থবিরতার কারণে এবং তাদের নির্বিচার

হত্যার সিদ্ধান্তটি মানবাধিকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করে বলেই ঔপন্যাসিকও তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে তা তুলে ধরেছেন। আইনের সুশাসন নিশ্চিত না হলে জনগণই সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগের শিকার হয়, উপন্যাসে এ সত্যটি স্পষ্ট।

ঘ.

একটি রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ড কিংবা একটি দেশ বা সমাজের কাঠামো একে অপরের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত; একটি প্রভাবিত করে অপরটিকে। সঠিক সামাজিকীকরণের (socialization) অভাব জন্ম দেয় মূল্যবোধের চর্চাবিহীন সমাজ-মানুষকে, প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় নষ্ট, কলুষিত, স্বার্থপর রাজনীতির। ধীরে ধীরে এই রাজনীতি ক্ষমতায়নের মাধ্যমে প্রভাবিত করে রাষ্ট্রের প্রশাসনিক নানা স্তরকে। পেশিশক্তি ও অর্থশক্তির বেড়ে চলা আধিপত্য কোনো নতুন সংস্কারের পথেও বাধা হয়ে দাঁড়ায়, একই সাথে ধ্বংস করে প্রথাগত নীতি ও মূল্যবোধ। একটা চরিত্রের ভেতরে-বাইরে এবং সর্বোপরি সমাজজীবনের ও সমাজ-মনস্তত্ত্বের সূত্রে কীভাবে রাজনীতি ঘিরে রয়েছে কিংবা অনিবার্যভাবে রাজনীতি কি করে সময়-সমাজ মানুষকে গ্রাস করেছে তা আলোচিত উপন্যাসগুলোতে ঔপন্যাসিকেরা নিরীক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। মূলত রাজনৈতিক চেতনা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যেমনটাই হোক উপন্যাস তথা সাহিত্য জন্মলগ্ন থেকেই তাকে ধারণ করেছে।

টীকা

১. রাজনৈতিক উপন্যাস সম্পর্কে এ ধরনের সংজ্ঞাটি দিয়েছেন সাহিত্য-সমালোচক ও সমাজবিজ্ঞানী আরভিং হো (১৯২০-১৯৯৩), যিনি বিখ্যাত *Politics and the Novel* (১৯৫৭) গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি লিখেছেন : "By a political novel I mean a novel in which political ideas play a dominant role or in which the political milieu is the dominant setting." (বিশ্ববন্ধু, ১৪১০ : ৬২৭)।

২. সমাজ-রাজনৈতিক বাস্তবতা সম্পর্কিত সময়পর্বের এই বিভাজন মূলত দেশ-কাল-চিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যসূচক। এটি সমগ্র রূপের সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণ নয়। (দ্রষ্টব্য, রফিকউল্লাহ, ২০০৩)। এখানে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় যে, লেখকের বক্তব্য উদ্ধার করতে গিয়ে আমরা সন উল্লেখের ক্ষেত্রে কিছুটা স্বাধীনতার আশ্রয় নিয়েছি। ১৯৭৫-১৯৮৯-এর স্থলে ১৯৭৫-১৯৯০ এবং ১৯৯০-১৯৯৬-এর স্থলে ১৯৯০-২০০০ উল্লেখ করা হয়েছে। এ ধরনের পরিবর্তনে লেখকের বক্তব্যের কোনো হেরফের হয় না বলেই এটুকু স্বাধীনতা গ্রহণ করা হয়েছে।

গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য, ১৪১০। বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস (প্রবন্ধ)। *সাহিত্য-প্রবন্ধ/প্রবন্ধ সাহিত্য* (হীরেন চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণগোপাল রায় সম্পাদিত)। কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।

মঈনুল আহসান সাবের, ২০০৬। *এই দেখা যায় বাংলাদেশ*। ঢাকা : দিব্যপ্রকাশ।

মঞ্জু সরকার, ২০০১। *উপন্যাস চতুষ্টয়*। ঢাকা : ঐতিহ্য।

মুহম্মদ জাফর ইকবাল, ২০০৬। *মহব্বত আলীর একদিন*। ঢাকা : অন্যপ্রকাশ।

রফিকউল্লাহ খান, ১৯৯৭। *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

রফিকউল্লাহ খান, ২০০৩। পঁচিশ বছরের বাংলাদেশের উপন্যাস (প্রবন্ধ)। *বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের সাহিত্য* (১৯৭২-৯৭) (সাঈদ-উর রহমান সম্পাদিত)। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

রাবেয়া খাতুন, ২০০১। *দূরে বৃষ্টি*। ঢাকা : অনন্যা।
রাহাত খান, ২০০৬। *রাজনীতির সুখ-দুঃখ*। 'যুগান্তর' (ঈদ সংখ্যা ২০০৬)। ঢাকা।
শহীদ ইকবাল, ২০০৩। *রাজনৈতিক চেতনা : বাংলাদেশের উপন্যাস*। ঢাকা : সাহিত্যিকা।
শহীদুল জহির, ২০০৭। *শহীদুল জহির নির্বাচিত উপন্যাস*। ঢাকা : সমাবেশ।
সেলিনা হোসেন, ২০০৫। *মর্গের নীল পাখি*। ঢাকা : অন্যপ্রকাশ।
সৈয়দ আকরম হোসেন, ১৯৯৭। *প্রসঙ্গ : বাংলা কথাসাহিত্য*। ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স।
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, ২০১০। *আজগুবি রাত*। ঢাকা : অন্যপ্রকাশ।
সৈয়দ শামসুল হক, ২০০৯। *সন্ধ্যাকাল*। ঢাকা : একুশে বাংলা।
হাসনাত আবদুল হাই, ২০০৬। 'যুগান্তর' (ঈদ সংখ্যা ২০০৬)। ঢাকা।
হুমায়ুন আজাদ, ১৯৯৮। *রাজনীতিবিদগণ*। ঢাকা : আগামী।
হুমায়ূন আহমেদ, ২০০৬। *হলুদ হিমু কালো র‍্যাব*। ঢাকা : অন্যপ্রকাশ।